রামেন্দ্রসুন্দর ও বাংলা সাহিত্য

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

[illegible]

রামেন্দ্রসুন্দর ও বাংলাসাহিত্য

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

অধ্যাপক, শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, হাওড়া

সাহিত্য তীর্থ

৪, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
২০শে আগষ্ট, ১৯৬৪
৪ ভাদ্র, ১৩৭১

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীকালীমোহন তালুকদার
৪, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলকাতা-১২

ছেপেছেন :
শ্রীসনৎ কুমার বানার্জী
স্বস্তিক মুদ্রণালয়
২৭/১ বি, বিধান সরণী,
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদলিপি
গ্রন্থকার

বেঁধেছেন :
বেলেঘাটা বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১২৩, বেলেঘাটা মেন রোড,
কলকাতা-১০

মূল্য—টা. ৪.৫০ পয়সা

আমার পরমপূজনীয় অধ্যাপক

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ

শ্রীচরণেষু—

॥ পাঠক্রম ॥

———

ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীমান্ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত প্রণীত 'রামেন্দ্রসুন্দর ও বাংলাসাহিত্য' শীর্ষক নাতিদীর্ঘ পুস্তিকাটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। আসন্ন রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিকী উৎসবের প্রবেশক হিসেবে এই গ্রন্থটি যে একটা বড় অভাব মোচন করবে, এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আবেগতরল বাঙলাদেশের এক বিচিত্র বিস্ময়। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আন্বীক্ষিকী তত্ত্বকথা—এককথায় যা মূলতঃ বুদ্ধিআশ্রয়ী, যুক্তিনির্ভর ও বস্তু-যাথার্থ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, বিজ্ঞানসাধক রামেন্দ্রসুন্দর সেই ক্ষুরধার মনন ও প্রতীতির উচ্চাবচ পথ অবলম্বন করেছিলেন। আজ তাঁর শতবার্ষিকী উৎসবে আচার্যদেবের সেই শুভ্র জ্ঞানোজ্জ্বল সাত্ত্বিক বিদ্‌বস্তুকে শ্রীমান সেনগুপ্ত যেভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে তাঁকে অন্তর থেকে সাধুবাদ দিতে হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরকে জানবার অর্থ—উনিশ শতকের যে চিত্তসঙ্কট বাঙলীর প্রাণের গভীরে কালোছায়া ফেলেছিল, তারই যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। বৃত্তিতে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ছাত্রসমাজে বাংলাভাষার মারফতে বিজ্ঞানকে বিশেষতঃ পদার্থবিজ্ঞানকে তিনি যেভাবে জনপ্রিয় করেছিলেন তা তাঁর ছাত্র ও শিষ্যসম্প্রদায়ের সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই জানা যায়। তাঁর লেখা বিজ্ঞানবিষয়ক নানা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের শেষভাগে য়ুরোপে প্রত্যভিজ্ঞামূলক যে বিজ্ঞানশাস্ত্র উপযোগবাদী কারুকর্মের নগদ বিদায়ের প্রলোভন ছেড়ে শুদ্ধ বিজ্ঞানের মনোময় কোষে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, আচার্য স্বয়ং তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং প্রথম দিকে বস্তুবিজ্ঞানের দ্বারা বুঝেছিলেন—বস্তুচেতনালব্ধ প্রত্যয় সমষ্টি বিশ্ববস্তুর একমাত্র নিয়ামক শক্তি।

ডারউইন, লামার্ক প্রভৃতি পণ্ডিতদের দ্বারা বিশ্বকারুকৃৎ ভগবান নামক সর্বগ শক্তির 'বিশেষসৃষ্টি'র গৌরব তিরোহিত হল, পূর্বেই নিউটন এসে গতিবিজ্ঞান ও স্থিতিবিজ্ঞানের সাহায্যে স্থাবর জঙ্গমকে একটি অমোঘ নিয়ামক সূত্রে বেঁধে দিলেন। ফলে চৈতন্যধারা, জীবধারা ও বস্তুধারা বাস্তব বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানময় সত্তার অধীন হল। পরে কার্লমার্কস ব্রিটিশ ম্যুজিয়মে বসে মানবেতিহাসের

বিবর্তন ধারাটিকে কার্যকারণাত্মক সম্বন্ধ, অর্থ নৈতিক মূল্যাবধারণা ও বিশ্লেষ সংশ্লেষ স্থিতিস্থাপকতার মধ্য দিয়ে আর এক চিত্তসঙ্কটের দ্বারে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ফ্রয়েড ও তৎশিষ্যবর্গও আবার মগ্নচৈতন্যের পঙ্কস্তরে প্রসুপ্ত 'মেডুসা' সর্পিনীগুলির বন্ধন মোচন করে চেতনার জগতে মহা হুলুস্থুল বাধিয়ে দিলেন। এর সঙ্গে যোগ দিল আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ ও বার্গসর গতিরাগ—বিবর্তনমূলক গতিবাদ। এঁরা মনে করিয়ে দিলেন 'ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড' হলেও বস্তুতঃ বস্তুর স্বারূপ্যই নেই। সমস্ত কিছুই অহম্ বা ইদম্ নামক এক কল্পিত ব্যক্তির কল্পনাসৃষ্ট বিশুদ্ধ ভোজবাজি! উনিশ শতকের শেষভাগেই আমাদের বহু শতাব্দী সঞ্চিত সংস্কার এবং বদ্ধমূল সিদ্ধপ্রত্যয় সংশয় নামক বিরাট খাদের সামনে এসে শিউরে উঠল। কারণ অদূরেই 'নাস্তি' নামক প্রকাণ্ড একটি নৈঃশব্দ মুখব্যাদান করে আছে। যে জ্ঞানের দ্বারা আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও দেহভাণ্ডকে হস্তামলকবৎ জেনেছিলাম, হঠাৎ দেখা গেল, সে জ্ঞান আমারই অহিফেন—নেশার ঝোঁকে সৃষ্ট গোলাপী আমেজমাত্র —নেশা ছুটলেই যার পরিসমাপ্তি। তাই দেখা গেল জড় বস্তুকণিকার অন্তরালে আর একটি অজ্ঞাত কুলশীল বিদেহী জীব উঁকি দিচ্ছেন। তিনি পঞ্চভূত, অসংখ্য এলিমেন্ট, ইথরমণ্ডল হতে পারেন, 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' হতে পারেন, নির্বায়ুমণ্ডলীভূত শূন্যত্বের হাহাকারও হতে পারেন। তিনি হতে পারেন বৈদান্তিকের ব্রহ্মম্, বার্হস্পত্যের দেহাত্মবাদী হেডোনিস্ট, ভোগকামী, অথবা অহুরমেজ্‌দা, পুদ্‌গল, অনাত্মবাদী 'জেন্'। মোটকথা গত শতাব্দীর শেষের দিকে পদার্থ ও 'অ'-পদার্থের মধ্যে যে জটিল জাল তালগোল পাকিয়ে উঠছিল, প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে সংশয় এসে গ্রাস করেছিল—সেই মায়াপুরীতেই রামেন্দ্রসুন্দরের আবির্ভাব। তিনি মানসসরোবরের রাজহংসের মতো পদার্থ বিজ্ঞানের স্থূলবস্তুপুঞ্জ থেকে অতি সহজেই বাকপথাতীত চিন্ময়লোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

ইন্দ্রিয় বস্তুজগৎ ও মনের রাসায়নিক সংমিশ্রণে যে প্রত্যয়ের উৎপত্তি হচ্ছে, তা যে ক্ষণভঙ্গবাদী প্রত্যয়ের সমষ্টিমাত্র তা তার চেয়ে আর কে জ্ঞানে বেশী করে বুঝেছেন ? আত্মার সেই সঙ্কট—একদিকে আকণ্ঠ জ্ঞানের পিপাসা, আর একদিকে চেতনার নির্মোক মোচন যাকে শাস্ত্র বলেছেন আবরণভঙ্গ; রামেন্দ্রসুন্দর এই দুই বিরোধী চিত্তদ্বন্দ্বের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ইহ ও পরত্রকে পিপ্পলী বৃক্ষশাখায় ঘনিষ্ঠভাবে উপবিষ্ট দুই সুপর্ণের সঙ্গে সমতুলিত করেছেন, পদার্থতত্ত্বের সঙ্গে মোক্ষশাস্ত্রের রাখীবন্ধন ঘটিয়েছেন। চিত্তের যে ক্ষুধা জ্ঞানার্জনে মেটেনা, সেই ক্ষুধা শান্তির জন্য তিনি যে অমৃতফল

আস্বাদন করেছিলেন, তা দেশকালপাত্র নিরপেক্ষ এমন একটা অদ্বয়সত্তা-যা তদ্ভাব ও সদ্ভাব, সৎ ও অসৎ, সর্বপ্রকার বিকল্পের বিনাশ করে।

রামেন্দ্রসুন্দর ঔপনিষদিক আর্যসাধনায় উত্তরাধিকার লাভ করেছেন স্বাধ্যায়ের দ্বারা—সে স্বাধ্যায় হচ্ছে তাঁর কর্ম, এই কর্মই তাঁর জীবনযজ্ঞ; সেই যজ্ঞকুণ্ড থেকে জাতবেদা অগ্নি আবির্ভূত হয়ে আচার্যদেবকে কৃশরান্ন ও ও বলিচরুভাগ দিয়েছেন, তাতেই তাঁর ক্ষুধা ও পিপাসার শান্তি হয়েছে, উনিশ শতকী মননধর্মী মানুষের আত্মার সঙ্কট ও তার যথার্থ প্রতীক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর সেই সঙ্কট থেকে ত্রাণ পাবার জন্য সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী ভর্গদেবতার উপাসনা করেছিলেন, একথা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

বর্তমান গ্রন্থে শ্রীমান প্রদ্যোত সেনগুপ্ত বহু পরিশ্রম করে আচার্যের পূত জীবনকথা, সাহিত্যকর্ম ও বিজ্ঞানসাধনার যে পরিচয় দিয়েছেন তার দ্বারা রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভা ও সাধনার স্বরূপ সহজেই অধিগত হবে। সম্প্রতি চিন্তাদীন বাংলাসাহিত্যে 'জর্ণালধর্মী' হাল্‌কা সুর টপ্‌পা-ঠুংরীর চালে যেভাবে পাঠকসমাজকে মোহাবিষ্ট করছে, তাতে আশঙ্কা হয়—তথাকথিত 'রম্যরচনার' রমণীয় ফেণোচ্ছ্বাসে মননপ্রণালী বুঝি অচিরে পরমাগতি লাভ করবে। কিন্তু আশ্বাসের কথা, বাঙলার মননশীল সাহিত্য 'দুর্মেধসে'র ভীতির কারণ হলেও তত্ত্বজ্ঞ রসিকের নিকট এখনও কৈবল্যপ্রাপ্ত হয়নি। শ্রীমান প্রদ্যোতের পুস্তিকাটি তা প্রমাণ করবে। মননেই মুক্তি—অন্ততঃ মননই মুক্তির প্রথম সোপান, আচার্য ত্রিবেদী তা বুঝেছিলেন, বহু সংস্কারে জড়ত্বপ্রাপ্ত দেশকে তা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন—লেখক এই পুস্তিকায় তা চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দুরূহকে জনপ্রিয় করবার সুলভতম পন্থা বেছে নেননি, কঠিনের সাধনায় সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন ও সাধনার বাক্‌সংযত ভাবমূর্তি নির্মাণ করে লেখক একটি পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করেছেন—এর জন্য তিনি পাঠকসমাজের কাছ থেকে প্রসন্ন অভিনন্দন লাভ করবেন—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বঙ্গভাষা-সাহিত্যবিভাগ
ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৪

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

3964

॥ লেখকের নিবেদন ॥

রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মশতবর্ষ লগ্নে আচার্যের মনীষা ও মনস্বিতার একটি সামগ্রিক পরিচয় দানের একান্ত একটি আগ্রহ মনে জেগেছিল প্রায় বছর খানেক আগে। বক্ষ্যমান গ্রন্থখানি মনের সেই ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার ফল।

জ্ঞানগর্ভ দুরূহ জটিল এবং তত্ত্বনির্ভর প্রাবন্ধিকদের একমাত্র আশ্রয় হ'য়ে পড়েন তত্ত্বসন্ধিৎসু সমালোচক এবং এ্যাকাডেমিক লক্ষ্যনির্ভর ছাত্রসমাজ। এ সিদ্ধান্তকে একরকম সার্বজনীন সত্য বলা যেতে পারে—বিরল ব্যাতিক্রম করাঙ্গুলি দিয়েই গণনীয়। অথচ সমাজ, সাহিত্য কিংবা সাংস্কৃতিক জীবনচর্যার ভিত্তিমূল পর্যালোচনা করতে গেলে প্রাবন্ধিকদের মানস-জিজ্ঞাসার একটি স্বয়ংস্বতন্ত্র মূল্যকে স্বীকার করতেই হয়—বাস্তবজিজ্ঞাসার ভিত্তিতে তার মধ্যে আমরা একটা স্বীকৃত সত্যের নির্দেশ লক্ষ্য করতে পারি। রামেন্দ্রসুন্দর প্রসংগেও একথা স্মরণীয়। তাঁর সাহিত্য সাধনা ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব দিয়ে তিনি মূলত উনিশ শতকের মনন প্রধান মানুষের আত্মার সংকট ও সেই সংকট মোচনের সাধনা করেছিলেন। উনিশ শতকের সমন্বিত জীবনাদর্শের ভাবপ্রচারক তিনি। বন্ধনমুক্তির সর্বাত্মক সাধনাকে 'শ্রেয়ো'র অভিমুখীন করেছিলেন—ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস ও স্থিরপ্রত্যয়কে তিনি তাঁর রচনার মধ্যে তত্ত্বসন্দীপ্ত স্থিরপ্রজ্ঞের মহৎ নির্দেশরূপে চিহ্নিত করে গেছেন। সেই পরিপূর্ণতা সমগ্রতা আর স্থির বিশ্বাসকে স্মরণ করা তাঁর শতবার্ষিকী লগ্নে আমাদের একান্ত কর্তব্য।

যুগপটভূমি, রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যধর্ম এবং দুর্লভ মনীষার যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। আচার্যের মূল বক্তব্যের সামগ্রিক পরিচায়নে তাঁরই মত ও যুক্তিকে ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনস্থলে উদ্ধৃত করে বক্তব্যকে পরিষ্কার করতে চেয়েছি। বাংলা-সাহিত্যে উন্নয়ন-চিন্তা তাঁকে কিভাবে ও কোন পথে পরিচালিত করেছিল—তা-ও আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। আলোচনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক কিছু কিছু পর্যালোচনা প্রসংগসূত্রেই আনতে হয়েছে। কতোখানি সফল হতে পেরেছে এ প্রয়াস—তার বিচার বিদগ্ধ পাঠকসমাজই করবেন।

এ গ্রন্থরচনায় আমার পরম পূজনীয় আচার্য প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সর্বাধিক প্রেরণা দিয়েছেন—আমার প্রতি তাঁর

স্বতোচ্ছলিত স্নেহ আমার পরম সম্পদ। এ ছাড়াও অজস্র উৎসাহ দিয়েছেন আমার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপকমণ্ডলী—প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর নিমাইসাধন বসু এবং অমার প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ দাস—আমার প্রতি তাঁদের স্নেহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না। তাঁদের সকলকে এই প্রসঙ্গে আমি প্রণাম নিবেদন করছি। আমার পরম পূজনীয় অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অতিশয় কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমার প্রতি স্নেহবশতঃ অত্যন্ত মূল্যবান ও তথ্যনিষ্ঠ একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে এ সামান্য গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অজিতকুমার ঘোষের কাছেই প্রথম সাহিত্যপাঠে দীক্ষা নিয়েছিলাম—তাঁর নিয়ত-উৎসাহ ও শুভাকাঙ্ক্ষা আমাকে চালিত করেছে—আজ এ গ্রন্থখানি তাঁকেই নিবেদন করে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

শ্রদ্ধেয়া শ্রীলীনাবসু, এম.এ.-এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। শ্রীজলি সেনগুপ্ত, এম.এ-র কাছ থেকে আমি উৎসাহ এবং সহযোগিতা লাভ করেছি। পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই অগ্রজপ্রতিম প্রকাশক শ্রীকালীমোহন তালুকদারকে—তিনি বিশেষ যত্নশীল হয়ে এ গ্রন্থখানি প্রকাশে অদম্য উৎসাহ দেখিয়েছেন। যথাসম্ভব সতর্ক থেকেও মুদ্রণগত বিচ্যুতি রইল—পাঠকেরা নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

গ্রন্থখানি রসজ্ঞ পাঠকের অনুমোদন লাভ করলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

॥ আচার্য-জন্মদিবস ॥
২০শে আগষ্ট, ১৯৬৪
১৬/১৭, বেলেঘাটা মেন রোড
কলকাতা-১০

বিনীত—
প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

রামেন্দ্র-প্রতিভা ঃ উন্মেষ ও জীবনভাষ্য

রবীন্দ্রপর্বের প্রথম অধ্যায়ে যিনি প্রবন্ধক্ষেত্রে বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও অভিনব কর্ষণায় বিশিষ্ট মনন ও স্বয়ংস্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্পষ্টোজ্জ্বল চিহ্ন রেখে গেছেন, তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪–১৯১৯) । তাঁর সর্বজনবিদিত প্রবল পাণ্ডিত্যের অনুকূলে তিনি বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-ধর্মতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, চরিত-সমালোচনা প্রভৃতি প্রবন্ধসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগীয় ও উপবিভাগীয় প্রচুর উল্লেখযোগ্য রচনা রেখে গেছেন। তাঁর প্রতিভার গভীর অভিনিবেশ বিজ্ঞান ও দর্শন শাখাকে কেন্দ্র করে বিশেষ তাৎপর্য পেলেও—'সাহিত্য' তাঁর জীবনে আরও ব্যাপক সত্য। তাই তাঁর এ-জাতীয় দুরূহ তথ্যসমৃদ্ধ রচনাও নির্বিবাদে রসের পর্যায়ে পদক্ষেপ করেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লিখিত সকল বিভাগগুলিতে তাঁর নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার স্পর্শ লাভ করা যায়। এ-ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বকে শৈলশিখরের নির্জন মহিমার সংগে তুলনা করা যেতে পারে। অন্তরের বিরাটত্বের ধ্যানই সেখানে সঞ্চারিত। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারায় উপরোক্ত বিভাগগুলির আলোচনায় রামেন্দ্র প্রতিভার বিশ্লেষণ ব্যাপকতার দাবী রাখে। প্রাবন্ধিক পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় এক জায়গায় রামেন্দ্রপ্রতিভা ও তার পরিপ্রেক্ষিতের উপর যে আলোকপাত করে-ছিলেন—তা বিশেষভাবে পর্যালোচনাযোগ্য ঃ "রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বঙ্কিমযুগ পর্যন্ত দীর্ঘকাল বাঙ্গালার ইংরেজি-নবীশ কেবল ব্যক্তিগত অভ্যুদয়ের চেষ্টায় বা আশায় ইংরেজি শিখিতেন না। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই যেন এক একটা 'মিশন' থাকিত। তাহারা প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে, আমরা ইউরোপের যে বিদ্যা শিখিতেছি, তাহা আমাদের একার উপভোগ্য নহে। জাতি ও সমাজের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সে বিদ্যালাভের আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে। কেবল টাকার জন্য, কেবল ভোগায়তন দেহের

তুষ্টিপুষ্টি সাধন উদ্দেশ্যে বাঙ্গালার প্রথম ও মধ্যযুগের কোন ইংরেজী-নবিশই উচ্চাঙ্গের ইউরোপীয় বিদ্যার চর্চা করিতেন না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী, শেষ কর্মী ও বিদ্যার সাধক ছিলেন। সত্যই তিনি একটা 'মিশন' লইয়া সারা জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছেন। ১ রামেন্দ্রসুন্দরের নিজেরই স্বীকারোক্তি এ বিষয়ে স্মরণযোগ্য: "যথাসাধ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিব। এই আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিয়াছিলাম। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তদর্থেই আমার প্রায় সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি।"

সাহিত্যের প্রতি তাঁর এই অন্তরঙ্গ নিষ্ঠার ও সাহিত্যসাধনার ইতিহাস আলোচনা করতে হলে তাঁর জীবনীর সূত্রের মধ্যেই তার পরিচয় নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী শক্তিপুরের নিকট ভাগীরথীর তীরে টেঁয়া বৈদ্যপুর গ্রামের বন্ধুল গোত্রীয় জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ হৃদয়রাম ত্রিবেদীর বসবাস ছিল। তাঁরই প্রপৌত্র বলভদ্র জেমো রাজবাটীতে লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা দয়াময়ীকে বিবাহ করে জেমোয় বাস করতে থাকেন। বলভদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণসুন্দরের পুত্রের নাম গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর। এই গোবিন্দসুন্দর রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা। রামেন্দ্রসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন ২০শে আগষ্ট, ১৮৬৪; রামেন্দ্রসুন্দরের বংশধারাই ছিল সাহিত্যরসিক। পিতামহ ব্রজসুন্দর 'মাধব-সুলোচনা' নামীয় একখানি গদ্যপদ্য-মিশ্র নাটক, 'স্বর্ণসিন্দুর সিংহ' বা 'গৌরলাল সিংহ' নামক একখানি প্রহসন-প্রণেতা। এ-ছাড়া শাস্ত্র বা পুরাণেও তাঁর প্রবল অনুরক্তি ছিল। পিতা গোবিন্দসুন্দরও ছিলেন সাহিত্যরসপিপাসু। তিনি 'বঙ্গবালা' নামে যে উপন্যাস রচনা করেছিলেন, পয়ারে রচিত তার ভূমিকা থেকে তাঁর প্রবল স্বদেশ চেতনার পরিচয় মেলে। পিতার কাছ থেকেই যে স্বদেশচেতনার পাঠ নিয়েছিলেন, উত্তরকালের রামেন্দ্রসুন্দর তা নিজেই স্বীকার করেছেন। এছাড়া গোবিন্দসুন্দর 'দ্রৌপদীনিগ্রহ' নামে অপর একখানি নাটকও রচনা করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের খুল্লতাত

---

১ পাঁচকড়ি - রচনাবলী: ২য়খণ্ড পৃঃ ৩৯৮

উপেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যানুরাগ সংস্কৃত শ্লোকরচনায় অত্যন্ত ক্ষিপ্র ছিল। পিতা, পিতৃব্য ও পরিবারের এই ঐতিহ্য অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই রামেন্দ্রপ্রতিভাকে অধিকার ও পরিচালিত করেছিল। ছাত্রজীবনে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে তিনি আশৈশব প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রসায়ন বিজ্ঞানে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। কর্মক্ষেত্রেও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রিপন কলেজের রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের স্থান গ্রহণ করেন। ইংরেজি স্কুলে পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি কবিতা রচনা করতেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' তাঁর সাহিত্যপিপাসু মনকে আকর্ষণ করত—লুকিয়ে 'বঙ্গদর্শন' পাঠ করতেন, পাঠ্যপুস্তকের সুনির্দিষ্ট রাজ্যের বাইরে বালকমন সাহিত্যরসের এক অনাস্বাদিত আনন্দ উন্মুখ হয়ে উপভোগ করত। পরবর্তীকালে 'ভারতী' পত্রিকার সংগে সম্পর্কসূত্রের ২ আত্মিক পরিচয় উদঘাটনে তিনি 'অম্ল-মধুর' নামে যে স্মৃতি-পর্যালোচনাটি রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর প্রতিভার উন্মেষ-পর্বের সংগে সম্পর্কিত কয়েকটি সূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তেইশ বছর বয়সে রামেন্দ্রসুন্দর যখন এম. এ ক্লাসের ছাত্র, ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীদের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম রচনা এই পত্রিকাতেই স্থানলাভ করে।

২

নব-জীবন 'পত্রিকাকে' কেন্দ্র করেই রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যসাধনার

---

২ "প্রবীণা ভারতী চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। সেই উপলক্ষ্যে কিছু বলিবার জন্য বর্তমান সম্পাদক এই অক্ষম ভারতী সেবককে আহ্বান করিয়াছেন। ভারতী এককালে আমাকে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন, এজন্য আমি ঋণী আছি।—ভারতী ঃ ১৩২৩

সূত্রপাত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' বাংলাসাময়িকপত্র—দ্বিতীয় খণ্ডে' এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন ঃ 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর হাতেখড়ি হয় এই 'নব-জীবনে' ; তাঁহার প্রথম রচনা—'মহাশক্তি' প্রথমবর্ষের পৌষ সংখ্যায় স্থান লাভ করিয়াছিল।" 'ভারতী'র (বৈশাখ ১৩২৩) পূর্বোক্ত স্মৃতিনিবন্ধটি থেকে এ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের নিজের বক্তব্যও স্মরণ করা যেতে পারে ঃ "নবজীবনের প্রথম বর্ষেই হঠাৎ একদিন মাসিক পত্রিকার লেখক হইয়া পড়িলাম। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলাম। যে পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার সরকার, লেখক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, তাহাতে স্বনামে প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহসী হইলাম না ; বেনামীতে পাঠাইলাম। কিন্তু পত্রিকার চতুর সম্পাদক কিরূপে প্রবন্ধ লেখককে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজনামেই প্রবন্ধটি বাহির হইল। সম্পাদকের ছুরিকার আঘাতে প্রবন্ধটি ক্ষত বিক্ষত হইয়া বাহির হইয়াছিল ; তাহাতে আমি উপকৃত হইয়াছিলাম। গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতের মত উহা আমি স্বীকার করিয়াছিলাম। বাঙ্গলা সাহিত্যে আমার গুরুমহাশয়ের সেই শাসন আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণে রাখিব।" নবজীবনে তাঁর আরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—বিবর্তন (শ্রাবণ, ১২৯২), মহাতরঙ্গ (অগ্রহায়ণ ১২৯২), জড়জগতের বিকাশ (আষাঢ় ১২৯৩) ; সৃষ্টিতত্ত্ব (শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৯৩) ; একমাত্র 'সৃষ্টিতত্ত্ব' ছাড়া অপর কোন প্রবন্ধে লেখকের নামোল্লেখ নেই। তবে 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'-কার গবেষক মন নিয়ে এ প্রবন্ধগুলি তাঁরই রচিত বলে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বজগতের অন্তর্লীন অনন্ত রহস্যের আকর্ষণে ব্যাখ্যাতার ভূমিকা নিয়েছেন তিনি সাহিত্য সাধনার উন্মেষ পর্ব থেকেই। প্রবন্ধগুলির মধ্যে ভাষার আত্যন্তিক উচ্ছ্বাস তাঁর সৃষ্টিচেতনায় এযুগে নিঃসন্দেহে প্রভাবজাত। সে স্বীকৃতিও অবশ্য তিনি দিয়েছেন ঃ "স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাবের গাম্ভীর্য ও ভাষার ছটা তখন মোহ আনিত। 'ভালবাসা এক মহাযজ্ঞ, এ যজ্ঞের আহুতি স্বার্থে, এ যজ্ঞের দক্ষিণা মান', 'তোমার মণিমুক্তার মোহনমালা দূরে রাখ, আমি মনুষ্যের নয়নবিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া লই।' 'অশ্রু ঝরে কার ?

না, যার হৃদয় আছে।' 'মনুষ্য কে? না, যে হৃদয়বান'—প্রভৃতি বাক্যাবলীর ভাষার ঝঙ্কার ও ভাবের মোহ এখনও আমাকে অভিভূত করে।"৩ অত্যল্প কালের মধ্যেই অবশ্য তিনি এ প্রভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নিজস্ব মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে স্বকীয় ভাষা গড়ে তুলতে হয়েছিল।

রামেন্দ্র প্রতিভা উন্মেষের সহায়করূপে সাময়িক পত্রিকার ভূমিকাও অকিঞ্চিৎকর নয়। ১২৯৮ এর অগ্রহায়ণ মাসে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রথমবর্ষের দ্বিতীয় ভাগে রামেন্দ্রসুন্দর 'আকাশতরঙ্গ' নামে এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 'সাধনা'য় এর পরে ধারাবাহিক ভাবে তাঁর বৈজ্ঞানিক ও বিবিধ দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। 'জন্মভূমি' (১২৯৭) 'দাসী' (১২৯৯) প্রভৃতি পত্রিকাও তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করে। সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' (বৈশাখ, ১২৯৭) পত্রিকার 'আনি বেসান্ট', 'একটি পুরাতন বিষয়', 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাই তাঁর 'যজ্ঞ' সম্বন্ধীয় মননধর্মী রচনা প্রকাশের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), আর্যাবর্ত্ত, মুকুল, মানসী, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি গবেষণাধর্মী ও মনন-সমৃদ্ধ বহু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। প্রবন্ধগুলি পরে বহুলাংশেই পুস্তকাকারে সংগৃহীত হলেও বহু বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত রচনা গ্রন্থভুক্ত হয়নি। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র অবদান তাঁর প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে—'আপন দ্বিতীয় রূপ'। তাঁর সংগঠক মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত এই প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্ররূপেই আলোচ্য। ১৩০৬ সাল থেকে ১৩১০ সাল পর্যন্ত এবং ১৩২৪–২৫ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সম্পাদনের পর্ব রামেন্দ্র প্রতিভার প্রৌঢ় পরিণতির ফসল।

---

৩ ভারতী : ৪০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

রামেন্দ্রসুন্দর ঃ ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার-স্বাতন্ত্র্য

রামেন্দ্র প্রতিভা উনবিংশ শতাব্দীকে গ্রহণ করেও আপনাকে বিস্তারিত করে দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর ক্ষেত্রেও—তাঁর সাধনা একটি সমন্বিত চেতনার সেতুবন্ধন করেছে। একদিকে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যগত জীবনধারার ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট ধারক। অপরদিকে তিনি বিজ্ঞানাশ্রয়ী মনন ও যুক্তিপন্থী। এক্ষেত্রে তিনি আত্মপরিচয় দিয়েছেন নিম্নোক্ত সূত্রে ঃ "আমি বৈজ্ঞানিকতার স্পর্ধা রাখিনা ; কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিকতাজীবী বিজ্ঞানভিক্ষু। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যবহারিক বিদ্যায় আমার নিকট অগ্রাহ্য।"১ বিজ্ঞান ও বেদান্তের বিজ্ঞান-মিশ্র দার্শনিক বিষয়ও তিনি সরলভাষায় বিবৃত করেছেন। এই বৈচিত্র্যধর্মে তিনি নিঃসন্দেহে স্বকীয়ত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু সাহিত্যবিচারে একবাক্যে এ সিদ্ধান্ত উচ্চারণ যথার্থ মূল্যায়নের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কেননা রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভা এই ধারায় পূর্বাপরহীন একান্ত একক নয়। সাহিত্য সাধকের ক্ষেত্রে দেশকালের প্রবাহ অনিবার্যরূপেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে স্বয়ংক্রিয় হতে বাধ্য। প্রতিভার ঐক-ব্যক্তিত্ব সেই প্রভাবকে গ্রহণ করেও অতিক্রমী হতে পারে—স্বকীয় তাৎপর্যে মৌলিক হয়ে উঠতে পারে। রামেন্দ্র প্রতিভা বিচারের ক্ষেত্রেও তাই সেই বিচার অনিবার্য। সাহিত্যক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের উন্মেষকালে একদিকে চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের তাৎপর্যপূর্ণ সাংগঠনিক মনোভূমি বিস্তৃত—অপরদিকে 'বিচিত্রকর্মা বিরাট রবীন্দ্রনাথ।' কিন্তু এ আলোচনার পূর্বে রামেন্দ্র-প্রতিভার সংগে সম্পর্কিত বিষয়ান্তরের কিছু পূর্ব পটভূমি স্মরণ করে নেওয়া প্রয়োজন।

বিজ্ঞান ও বেদান্তের কঠিন সমস্যাকে রামেন্দ্রসুন্দর অনায়াসে উপস্থাপিত করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে বিষয় দুটিকে আপাত

১ বিচিত্র জগৎ ঃ প্রাণময় জগৎ

বিরোধী বলে মনে হতে পারে। বিজ্ঞান বিশ্লেষণ ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যবহারিক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সত্য আবিষ্কার করতে চায়—বেদান্তে আত্যন্তিক নিরাসক্তি নিয়েই সত্যকে দেখে। প্রথমটির আলোচ্য ব্রহ্মতত্ত্ব, দ্বিতীয়টির অবলম্বন পার্থিব বস্তু। তথাপি বিজ্ঞান ও বেদান্তের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক আছে। চিন্তাসূত্রের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতকের শেষপর্বে বেদান্ত-উপনিষদের চর্চা অবহেলিত হয়ে পড়ে। তন্ত্রের ব্যবহারিক দিকটাই অভিচারমূলক একপ্রকার রূপ লাভ করে। হ্যালহেডের 'The Grammar of Bengal Language (১৭৭৮ খ্রীঃ) গ্রন্থে উপনিষদের কয়েকটি শ্লোকের পরিচয় মেলে রামমোহনের প্রাক্-বেদান্তচর্চা পর্বে। রামমোহনের সমসাময়িক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যে ছাত্রদের বেদান্তাদি শিক্ষা দিতেন সে বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০) নামীয় রচনায়। উনিশ শতকের প্রারম্ভে রামমোহনের (১৭৭৪-১৮৩৩) ভূমিকা প্রত্যয়নিষ্ঠ২ যুগলক্ষণেরই ধারক ও উদ্ভিন্ন ভাবপ্রচারক। সমাজ-বিষয়ক জ্ঞানকর্মবাদী ও আধ্যাত্মিক স্ব-সম্পূর্ণতা তাঁর প্রতিভায় যুগ্মবেণী রচনা করেছিল। তাঁর মধ্যের দুর্লভ মণীষা, নৈয়ায়িক বোধ, স্ব-তন্ত্র ধর্মমানসিকতা তাঁর প্রতিভাকে সর্বায়ত বিস্তার দান করেছিল। তাঁর প্রচারিত বেদান্ত-তত্ত্বে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ একেশ্বরবাদে গৃহীদের অধিকার সামর্থ্যকেও ৩ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিক সমাজচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই বেদান্ত-তত্ত্বকে অবিরোধে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। রাষ্ট্র বা সমাজের ক্ষেত্রে বেদান্তের মায়া-বাদকে তিনি যে উৎসাদিত করতে চেয়েছিলেন, আমহার্ষ্টকে লিখিত পত্র থেকে তাঁর সেই বিষয়ক বিখ্যাত বক্তব্যকে স্মরণ করা যেতে পারে:

---

২ রামমোহন গ্রন্থাবলী

৩ ঈশোপনিষদের (১৮১৬) ভূমিকায় রামমোহন বলেছেন: "……আত্মতত্ত্ব ধ্যানেতে আসক্ত হয়েন এমন ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন অর্থাৎ কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমন নহে, কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরও মুক্তি হয়।"

"Nor will youths be fitted to be better members of society, by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence that as father, brother etc have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore, the sooner we escape from them and leave the world the better." রামমোহনের এই ধর্মদেশনার মূলে একট বিস্তৃতার্থ-বোধক মানসিকতাই প্রচ্ছন্ন ছিল। ধর্মীয় আধ্যাত্মিক দাসত্ব থেকে সমাজমনের সার্বিক মুক্তি, ধর্মীয় ক্ষেত্রে একটি বিশ্বভৌম বাস্তব পরি-প্রেক্ষিত রচনা করতে চেয়েছিলেন তিনি। ম্যাক্সমূলারের রামমোহন পরিচায়ক বক্তব্যটির সুপ্রযুক্ততা বিষয়ে স্মরণ করা যেতে পারে: "father of Comperative theology"; রামমোহনের ধর্মসংস্কার রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যবিধানেরই সংশ্লেষিত, অতি-সম্পন্ন এবং ঐশ্বর্যদীপ্ত রূপ। বেদান্তের ধর্মীয় ব্যাখ্যানের পটভূমিতে জাতির ঐহিক মূল্য প্রবর্তনা ও হিতৈষণাই ছিল তাঁর মৌল লক্ষ্য।৪ কাজেই বেদান্তের প্রচার তাঁর ক্ষেত্রে ধর্মসংস্কার থেকে মুক্ত হবার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ একটি ব্যবহারিক সোপান। এ ক্ষেত্রে তাঁর মনন বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক। এই প্রকার যুক্তিচিন্তামূলক সুনিষ্ঠ চেতনার এষণা সমসাময়িক গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কিংবা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে মেলে না। বেদান্তের তত্ত্ববাদের সঙ্গে জ্ঞানপন্থী বুদ্ধিবাদ এবং বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক চেতনার উদ্বোধন আমরা লক্ষ্য করেছি অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) সংস্কারমুক্ত মনোজীবনে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনাভার (১৮৪৩-১৮৫৫) গ্রহণ করে তিনি বৃহৎ কর্মৈষণার মধ্য দিয়ে যুক্তি ও বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে চাইলেন। ঈশ্বরজ্ঞান প্রচার এই পত্রিকার অনন্য উদ্দেশ্য হলেও অক্ষয়কুমারের চেষ্টাতেই এ পত্রিকায় গভীরতা ও চিন্তাশীলতার অনুশীলনে সাহিত্য-বিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্বাদি-

৪ ......that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort."

বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত হয়।৫ তিনি ছিলেন রামমোহন-অনুসারী। রামমোহনের উদ্দেশ্যে তার সশ্রদ্ধ নিবেদনই এ বিষয় প্রমাণ করে—"তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নহে। তুমি একটি সুবিস্তর মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছ....যাঁহারা আবহমানকাল হিন্দুজাতির মনোরাজ্যে নির্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাহাদিগকেও পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা।...... তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য করিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত করিতেছে। যে পরমধর্ম সমুদয় মনুষ্যের মানসপটে ও সকল বাহ্য পদার্থের সর্বস্থানে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রচার করণার্থে তিনি প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, তিনি কেবল এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থমাত্রকে পরমেশ্বর প্রণীত শাস্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করিতেন এবং তদীয় আলোচনা ও তন্মূলক গ্রন্থানুশীলন দ্বারা স্বয়ং চরিতার্থ হইয়াছিলেন।" রামমোহন যুগাতিক্রান্তিকারী—কিন্তু শাস্ত্রনির্দিষ্ট আনুগত্য বা অনুসরণ তাঁর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণত অনুপস্থিত নয়। কিন্তু অক্ষয়কুমার অসন্দিগ্ধ মনেই উচ্চারণ করেন—"বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে—বিশ্ব বেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত।" (১৭৭২ শকাব্দে ১১ই মাঘ সাংবৎসরিক বক্তৃতা) তিনি নিরীশ্বরবাদী ন —তথাপি বেদান্তের সংগে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবাদের কার্যকারণ-রূপকে তিনি বিচার করলেন ঐহিকবোধ সম্পন্ন আত্মবুদ্ধির কর্ষণায়।

---

৫ রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষযক প্রস্তাব' (১২ই আষাঢ় ১৭৯৫ শকাব্দ) গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন: "তিনভাগ 'চারুপাঠ', দুই ভাগ 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', ধর্মনীতি, পদার্থবিদ্যা ও দুই ভাগ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় এই কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১ম, ২য় ভাগ চারুপাঠের প্রস্তাবগুলির কয়েকটি 'সংবাদপ্রভাকর' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার পূর্বে বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তবপদার্থ সংক্রান্ত এরূপ মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক রচিত হয় নাই।"

বিজ্ঞানের সংগে তার সমন্বয়ের পটভূমিতে জগৎ ও জীবনচর্যার বিচার করলেন তিনি। মানবজীবনের সংগে বহির্জগতের সম্পর্ক বিনির্ণয়, প্রাকৃতিক নির্দেশ পালনের মধ্য দিয়েই ঐশ্বরিক তত্ত্ব ও নীতির অপৃথক পর্যালোচনা, ভারতীয় শাস্ত্রনির্দিষ্ট ও লৌকিক এই উভয়ত দিকের আয়তনে ধর্ম-উপধর্ম সম্প্রদায়ের গবেষণানিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ধর্মীয় অনুষঙ্গকে আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রে সমন্বিত করেছেন। জর্জ কুম্ব, উইলসন প্রভৃতির বিজ্ঞাননিষ্ঠ চিন্তাক্রমকে অনুসরণ করেও তিনি এদেশীয় জনরুচি ও প্রয়োজনকে উপেক্ষা করেননি।

অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) কাছ থেকে ব্রহ্মের বিশ্বাস, ঔপনিষদিক সংযত ভক্তিবাদকে গ্রহণ করলেও উভয়ের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের মধ্যে ব্যবধান ছিল। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতেই সে বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ রয়েছে ঃ "আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ। আকাশ-পাতাল প্রভেদ!" বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের যে ভূমিকা দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন তার মূলে একটি সুনির্দিষ্ট স্বাদেশিক চেতনাও অন্তর্নিহিত ছিল—'যদি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে।" এবং "আমরা ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম। বেদান্তদর্শনকে শ্রদ্ধা করিতাম না; যে হেতুক তাহাতে শঙ্করাচার্য জীব আর ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে। যদি উপাস্য-উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহার উপাসনা করিবে? অতএব বেদান্ত দর্শনের মতে আমরা মত দিতে পারিলাম না। আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদীদেরও বিরোধী। শঙ্করাচার্য উপনিষদের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে লইতে পারিলাম না, যে হেতুক তিনি অদ্বৈতবাদের পক্ষে টানিয়া তাহার সমুদায় অর্থ করিয়াছেন। এই জন্যই ভাষ্যের পরিবর্তে আমার আবার নূতন করিয়া উপনিষদের বৃত্তি

লিখিতে হইয়াছিল। যাহাতে ঈশ্বরের সংগে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ রক্ষিত হয়, আমি ইহার সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাতে বৃত্তি করিয়া ইহার অনুবাদ বাঙ্গালাতে লিখিতে লাগিলাম এবং ক্রমে ক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ হইতে লাগিল।" দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে ছিল ভক্তিবাদের ছায়াশূন্যতা। ধর্মসংস্কারের মধ্যে কোন বৃহত্তর সামাজিক দৃষ্টিভংগীর নির্ণায়ক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হয়তো সেখানে ছিলনা। ১৮৪৮এ:দেবেন্দ্রনাথ অধিক বিস্তৃতভাবে বেদ ও উপনিষদ অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। ঐ সময়েই ব্যবসায় পতনের ফলে তাঁর পিতার বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায়। এই পর্বের একটি স্বীকারোক্তিই তাঁর আত্যন্তিক ধর্ম প্রবণ মনটিকে উদাহৃত করে দেয়—"এই সময়ে আমি সকালে দুই প্রহর পর্যন্ত গভীর দর্শনশাস্ত্রের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। দুই প্রহরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বেদ–বেদান্ত-মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় ও বাঙ্গলা ভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদে নিযুক্ত থাকিতাম। সন্ধ্যার সময় ছাদের উপর প্রশস্ত কম্বল পাতিয়া বসিতাম। সেখানে আমার কাছে বসিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মেরা, ধর্মজিজ্ঞাসু সাধুরা নানাশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। এই আলোচনাতেও কখন কখন রাত্রি দুই প্রহরও অতিবাহিত হইয়া যাইত। সেই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ সকলও পরিদর্শন করিতাম॥" (দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পৃঃ ১০৮) বক্তব্যের সংগে একটি সুনিষ্ঠ ধর্মীয় শান্তরসাশ্রিত পরিমণ্ডল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু অক্ষয়কুমার তাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। এই সূত্রেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে অবলম্বন করে দেবেন্দ্রনাথের সংগে মতান্তর তীব্র হয়ে উঠত। দেবেন্দ্রনাথ মতবিরোধকেই ব্যক্ত করতেন—"কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিস্কৃত করিয়া না দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।" কাজেই বিদগ্ধ সমালোচক যথার্থই বলেছেন: "দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারেই সৎ অসৎ বিবেচনা করিয়া ক্রিয়ার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকটা 'স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য করিয়া গিয়াছেন।……দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্র ছিল প্রকৃতির সৌন্দর্যের

মধ্যে এক নিরাকার স্বগুণ ব্রহ্মের দর্শন লাভ করিয়া ধ্যানে তাঁহার সহিত বিহার করা।"৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনাপর্বে জ্ঞাননিষ্ঠ অক্ষয়কুমারের অপর একটা মহৎ দান উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রেও তার মূল্য অপরোক্ষ নয়। বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থে।" ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।" বেদান্ত ধর্মের স্থিরীকৃত অভ্রান্ততার মানদণ্ড থেকে দেবেন্দ্রনাথের মনকে অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগে অনেকটা বিবর্তিত মানসের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন। বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয় কুমারের অবলম্বিত মতকে যুক্তিসিদ্ধ বলে বিবেচনা করার পর দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করেছিলেন। এরই প্রতিক্রিয়া রূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: "........১৮৫২ সালের কথা কহিতেছি, তখনও এই মহা-পরিবর্তন ব্রাহ্মসমাজকে ও সমগ্র বঙ্গদেশকে আন্দোলিত করিতেছে। তখনও দত্ত মহাশয় স্বীয় মতের জয় দেখিয়া মহোৎসাহে উদার, আধ্যাত্মিক, একেশ্বরবাদের মহানিনাদে তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ সকলকে পূর্ণ করিতেছেন।"৭ কাজেই বাংলা সাহিত্যে ধর্মজিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতকে স্থিতধী যুক্তিনিষ্ঠ বিচারের দ্বারা একটি যুগমানস নিয়ন্ত্রণে অক্ষয়কুমার দত্ত বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বেদান্তের তত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে যুগমানসের ঐতিহ্যগত চিন্তাচেতনার এই সম্প্রসারিত রূপ রামেন্দ্রসুন্দরেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। অক্ষয় কুমারের যুক্তিবাদী পর্যালোচনার তিনি স্পষ্ট ধারক। আবার প্রভাব

---

৬ স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালায় ঊনবিংশ শতাব্দী: গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী।

৭ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ: শিবনাথশাস্ত্রী

অতিক্রমী স্বয়ং স্বতন্ত্র প্রতিভা-পরিচয়ের উদ্ভাবক। রামেন্দ্রস্থন্দর মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসাকে সমন্বিত করবার চেষ্টা করেছেন। নিরাসক্তভাবে মানবজীবন দর্শনের জন্যই তাঁর এই বিজ্ঞান, সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতা সংশ্লিষ্ট পর্যালোচনা। আলোচনার গভীরে কাব্যসৌন্দর্যের অনুভূতি স্বয়ংক্রিয় থেকে সাহিত্যের সৌরভ এনেছে। রামেন্দ্রস্থন্দর বেদান্তের জগৎকে নেতিবাদের দিক করেছিলেন। তাঁর উপস্থাপিত তত্ত্ব আমাদের জিজ্ঞাসামুখর করে তোলে—জীবনের সত্য সম্বন্ধে পাঠককেই তিনি সিদ্ধান্ত নির্ধারণের অধিকার দান করেছেন। রামেন্দ্রস্থন্দরের মধ্যে ছিল একটা দ্বৈত সত্তা। দার্শনিক রামেন্দ্রস্থন্দরের সংশয়বাদী ও নৈরাশ্যমুখর চেতনায় ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ছিল না। আবার ব্যক্তি রামেন্দ্রস্থন্দর স্থগভীর আত্মসমাহিতিতে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতিও অশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণের' অনুবাদের মধ্য দিয়ে বৈদিক সাহিত্য পরিমণ্ডলে তাঁর পদক্ষেপ ঘটেছিল। প্রবন্ধগুলি 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর এগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বৈদিক ভারতের যজ্ঞকথার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দানকরেছেন 'যজ্ঞকথা', 'কর্মকথা' (১৩২০) প্রভৃতি প্রবন্ধে বিন্যস্ত চিন্তাধারায়। বেদপন্থী ভারতের উদার ও ভাস্বর গাম্ভীর্যই এগুলিতে তাঁর মনোলোকের ঐশ্বর্যকে ধ্যানতন্ময় রূপ দান করেছে। এই বেদপন্থী কর্মনুষ্ঠানকে তিনি জীবনোপলব্ধির নিয়ন্ত্রক শক্তিরূপে দেখেছিলেন: "ভারতবর্ষের যজ্ঞভূমি জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড চিতা নির্মিত রহিয়াছে; বেদপন্থী সমাজের যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা তাঁহারা বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—সেই অগ্নির প্রভায় অর্ধ পৃথিবী প্রভাবান্বিত হইয়াছে। সিংহল হইতে সাইবীরিয়া পর্যন্ত, যবদ্বীপ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত, জাপান হইতে কাস্পীয় তট পর্যন্ত অর্ধ পৃথিবী সেই অগ্নির প্রভায় প্রভাবান্বিত হইয়াছে। ভারতমাতা সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন; মা আমার ভোগ্য অন্নরূপে বুভুক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন।" ভক্তিবিনম্র প্রীতিঘন অশেষ শক্তির উদ্বোধক এ যেন এক

কাব্যমন্ত্র পাঠ। কর্মের মধ্য দিয়ে জাতি ও ধর্মৈষণার প্রয়োজনবাদের মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনের ও বিকাশের ব্যাখ্যা দান করেছেন তিনি 'কর্মকথায়'—"আমরা যখন যথা ধর্ম তথা জয় এই নীতিবাক্যের উল্লেখ করি, তখন আমরা সেই অদৃশ্য দুর্বোধ্য জগদ্বিধানকেই লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করি।" আর মনুষ্যজীবনে কর্মের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক অগ্রগতিই মূলতঃ অনুসরণীয় হওয়া উচিত। এ গ্রন্থের সমগ্র রচনাগুলির মধ্যেই এই আবেদন সু-উচ্চারিত। 'কুর্বন্নেবেহ কর্মানি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ' এই উক্তির বলিষ্ঠ তাৎপর্যই প্রবন্ধগুলিকে ঐক্যসূত্রে সন্নিবিষ্ট করতে চেয়েছে। বেদপন্থানুসারী সমাজধর্মের অন্তরের মধ্যেই তিনি কর্মবাদের সুগভীর তাৎপর্যকে আবিষ্কার করেছেন। এই সংকলনের অন্তর্বর্তী 'যজ্ঞ' প্রবন্ধে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক লোকোত্তরণের মধ্যেও যুক্তির ক্রমটি বৈজ্ঞানিক সূত্রেই বিন্যস্ত হয়েছে : "ত্যাগ দ্বারাই জীবের জীবত্বের সার্থকতা এবং ত্যাগাত্মক ধর্মই ধর্ম। এই ভিত্তির উপর বেদপন্থীর ধর্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। জীবের পক্ষে কর্ম ত্যাগ করিবার উপায় নাই।" "এ মতবাদ 'ভূমিকা' অংশেও তিনি স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন—ঐহিক বা পারত্রিক স্বার্থপরতা হইতে যে বৈরাগ্যের জন্ম, যদ্বারা মানুষে জীবনের কর্মভার গ্রহণে কুণ্ঠিত হয়, স্বার্থপর শান্তির পরার্থপর অশান্তি স্বীকারে কুণ্ঠিত হয়, সেই বৈরাগ্যই আমার কটাক্ষের বিষয়। আমার বিশ্বাস, আমাদের ধর্মশাস্ত্র এই বৈরাগ্যের কখনই প্রশ্রয় দেন নাই এবং সেইজন্যই গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের উচ্চে স্থান দিয়াছেন।" কর্মোদ্দীপনাকেই আত্যন্তিক নিষ্ঠায় নতুনভাবে এ-ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের সমস্ত অনৈক্য খণ্ডন করে এক্ষেত্রে তিনি এক উদার কর্মনীতিরই তত্ত্ব-আবিষ্কার প্রয়াসী—পরিবেশের সংগে মানুষ সম্পর্কসূত্রেই কেন্দ্রবদ্ধ ; এই সম্পর্কের পটভূমিতেই এ কর্তব্যকে বাধ্যতামূলক বলে তিনি দাবী করেছেন। এই বৃহত্তর কর্তব্যের আহ্বানে, এই মহৎ কর্মকথায় কতকগুলি প্রচলিত আচারের অনুসরণ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তিজীবনের অসুন্দর অথচ স্বাভাবিক অনুষ্ঠানকে

সমাজজীবনের সংগে শোভন-সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই তিনি ব্রাহ্মণ-প্রণীত শাস্ত্রীয় বিধানের তাৎপর্য আবিষ্কারের প্রয়াসী। তবে এই চেতনার সংগে নেতিবাচক সুরে স্পষ্ট সমালোচনার সুরও অনুপস্থিত নয়। তিনি প্রায় একই নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেছেন : "এই সকল কৃত্রিম বিধানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অযথা সংযম ঘটিতে পারে, সংকীর্ণতার প্রশ্রয় হইতে পারে।" রামেন্দ্রসুন্দরের নিজস্ব দার্শনিক মতের উচ্চাঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায় 'মুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে : "আমি কেন আপনাতে মায়ার আরোপ করিয়া, ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া জগতের সৃষ্টি করি, আর কেনই বা আপনাতে এই অবিদ্যার আরোপ করিয়া জগতের দাসত্ব অভিনয় করিয়া প্রতারিত হই—তাহার উত্তর বোধকরি নাই। বেদান্ত বলেন, উহাই আমার স্বভাব, বৈষ্ণব বলেন, উহা আমার লীলা বা খেয়াল ; শাক্ত বলেন, উহা আমার আনন্দ ; বৌদ্ধ বা অজ্ঞানবাদী বলেন, উহা জিজ্ঞাসা করিও না।" শঙ্করাচার্যের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর মানস বিজ্ঞান-অনুসারী। রামেন্দ্রসুন্দরের 'মুক্তি' চেতনা তাই জ্ঞানমুখ্য।

২

এ-দিক থেকে বিবেকানন্দের(১৮৬৩-১৯০২) বেদান্ত-ধারণার সংগে রামেন্দ্রসুন্দরের মতবাদের কিছু তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যেতে পারে। কেননা দেশ-কালের সীমার পটভূমিতে বিবেকানন্দ-পর্বেই রামেন্দ্র প্রতিভার বিস্তার ঘটেছিল। কাজেই চিন্তানায়ক মনীষী বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁর মধ্যে কতোখানি বা সে প্রভাব অতিক্রমেই বা তিনি কতোখানি সার্থক, সে বিচার আবশ্যক। স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক ভারতের ধ্যান ও কর্ম-এষণার মূর্ত রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের একটি সুনির্দিষ্ট বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। উপযোগবাদকে তিনি প্রত্যাহার করেননি। ধর্ম্ম-কর্ম্ম রাজনীতি, সমাজ বা জীবননীতি সব ক্ষেত্রেই তিনি কর্মযোগের যে ভূমিকা নির্দিষ্ট করেছেন—তার মধ্যে ঐহিকতা প্রধান-বৃত্ত। বাস্তবনিষ্ঠ ঐহিকতার সংসক্তির সংগে তিনি

কর্মবাদকে সাম্যসূত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাজেই ইহবিমুখী তীব্র অনীহাই যে বেদান্তের চেতনামাত্র নয়—সে কথাই তিনি প্রচার করলেন। অধ্যাস থেকে মুক্ত করে তিনি ব্যবহারিক জীবন ক্ষেত্রে বেদান্তের প্রভাবকে বলিষ্ঠ তাৎপর্য দান করলেন, কালের সংগে বেদান্ততত্ত্বের অন্বয় ঘটালো। তাই তাঁর প্রাণ-উজ্জীবনী উক্তিঃ "শুধু বেদান্ত পড়ে কি হবে ? আমাদের বাস্তবজীবনে বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্বকে পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এতদিন ধরে অদ্বৈতবাদ বনেজঙ্গলে আর গিরিকন্দরে বন্দী হয়ে ছিল। আমি একে নির্জনতা থেকে বার করে নিয়ে আসব, আর প্রতিদিনের কর্মে ও বাস্তবজীবনে এর মহৎবাণীকে ছড়িয়ে দেব। অদ্বৈত-দুন্দুভি প্রতি গৃহকোণে ধ্বনিত হোক্, পথে প্রান্তরে, পাহাড়ে-পর্বতে অদ্বৈতবাণী বিচ্ছুরিত হোক্। এস ভাই, আমাকে সাহায্য কর, কেবল কাজ করে যাও।" তামসিকতা-মুক্ত নব-বেদান্তবাদের উদ্বোধক বিবেকানন্দ ঊনিশ শতকের 'মানবিক' বাদের কথা 'জগদ্ধিতায়' পটভূমির ব্যাপকতায় 'ইহ' মুখীনতাকেই আদি-বিচার রূপে দাবী করেছেনঃ "ফেলে দে তোর শাস্ত্রফাস্ত্র গঙ্গাজলে! দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবৎ পড়ে শুনাস। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্মকথায় কেউ কান দেবে না।"[৮] একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় বেদান্ত আমাদের শিক্ষা দিতে পারে, আধ্যাত্মিক কল্যাণের সংগে বেদান্ত দৈনন্দিন জীবনেও প্রয়োগসম এবং ফলতঃ তা ঐহিক কল্যাণেরই অভ্যুদয় ঘটাতে পারে। বিবেকানন্দ ক্রমবিকাশ-বাদের উপর বেদান্ততত্ত্বকে অভ্রান্ত সত্যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই ক্রমবিকাশের সূত্রে রামেন্দ্রসুন্দর জীবন সংগ্রামের ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ ছবি এঁকেছেন। ঈশ্বর যে সকল জীবের আহার দাতা ও রক্ষাকর্তা সে বিষয়টি স্বীকার করেই তিনি বলেছেনঃ "কথাটা ঠিক, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ধরাধাম শাসক চিড়িয়াখানার মালিক সহস্র কোটি

৮ 'স্বামিশিষ্যসংবাদ'

জীবকে এই চিড়িয়াখানায় অবরুদ্ধ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। তোমরা পরস্পরকে ভক্ষণ কর, আমি তোমাদের অন্নসংগ্রহের জন্য এক পয়সা ঘরের কড়ি খরচ করতে প্রস্তুত নহি কিন্তু তোমরা যদি পরস্পরকে ধরিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে কাহারও অন্নাভাবে কষ্ট হইবে না ; অতএব পরমানন্দে পরস্পরকে ভোজন কর। আহার দানের ও রক্ষাকর্মের ইহা অতি উত্তম বন্দোবস্ত, সন্দেহ নাই: মানুষের ঐহিক প্রয়োজনকে তিনিও বড় করে দেখেছেন। সকল রকম আধ্যাত্মিক চেতনার সংগে তিনি সেই বিজ্ঞানের আনন্দোৎসেরই উল্লেখ করেছেন—"জীবনের সমরক্ষেত্রে পরস্পর যুধ্যমান কোটি মানবের পাদপীড়নে যে ধূলিরাশি উত্থিত হইতেছে, সেই ধূলিবিক্ষেপে এই বিশুদ্ধ আনন্দধারাকে কলুষিত করিও না। ঋষি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞানই আনন্দ ও বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। এই কল্পিত মায়াপুরীতে বদ্ধ জীব যদি ব্যবহারিক জগতের সম্পর্কে থাকিয়াও পূর্ণ ভূমানন্দের পূর্বাস্বাদ লাভে অধিকারী হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উৎস হইতে যে আনন্দপ্রবাহ বিগলিত হইতেছে, তাহাকে ব্যবহারিক জীবনের সুখদুঃখের কর্দমলিপ্ত করিয়া পঙ্কিল করিও না।" (মায়াপুরী) দর্শনের সংগে বিজ্ঞানকে যুক্ত করে রামেন্দ্রসুন্দর মানব সভ্যতার যুগোচিত চিন্তার আবিষ্কার করেছেন এই ভাবেই। প্রসংগত রামেন্দ্রসুন্দর বাহ্যজগতের সংগে জীবদেহের সম্পর্কও বিনির্ণয় করেছেন।

বেদান্তের নেতিবাদ দ্বারাই তিনি স্বরূপতঃ প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'জিজ্ঞাসা'র 'সুখ না দুঃখ' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর সুখবাদী ও দুঃখবাদী দার্শনিকের যুক্তি পরম্পরা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এখানেও বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যেই জীবনের মৌল সত্য নির্ধারণ করেছেন লেখক। সুস্পষ্ট নেতিবাদের দিকে লেখকের প্রবণতাই এক্ষেত্রে লক্ষিত হয়। 'পঞ্চভূত' শীর্ষক প্রবন্ধেও দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্মিলিত রূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের শুধুমাত্র দৃষ্টিভংগীতেই

পার্থক্য—উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উভয়তই জগতের মৌল উপকরণই অবলম্বনীয় হয়ে থাকে। দার্শনিকের দৃষ্টিতে এই উপাদানসমূহ রূপ-রসাদির সমষ্টিরূপ। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও পার্থিব পদার্থসমূহের বিশ্লেষণে এই সমষ্টিরূপেরই সন্ধান পেয়ে থাকেন। সাংখ্য ও বেদান্তর্গত বিশ্লেষণ প্রণালীর সংগেও এর আনুরূপ্য রয়েছে। তবে বেদান্তদর্শনের এই পঞ্চভূতাখ্য সংজ্ঞা যে কল্পনানির্ভর এবং বিজ্ঞানের সংগে এই মনঃকল্পনারও যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র রয়েছে রামেন্দ্রসুন্দর সে বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। বেদান্তের মনঃসমীক্ষণের সংগে বিজ্ঞানের সূত্রকে মেলাবার জন্য তিনি যে কতোখানি .ভাবিত ছিলেন, এ থেকে তা প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনার সিদ্ধান্তটি প্রণিধান যোগ্য : "....যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের এইরূপ সমন্বয় করিতে যান, তাঁহারা একটি ভুল করেন। বিজ্ঞান বিদ্যাটাই পরি-বর্তনশীল, উন্নতিশীল বলিতে চাও ক্ষতি নাই। উহার সিদ্ধান্তগুলি ক্রমশঃ পরিবর্তিত ও পরিণত হইতেছে। বিজ্ঞান কোনদিন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না, আজ যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে, কাল সে সিদ্ধান্ত বদলাইয়া লইবে। ....কাজেই আজি যদি প্রাচীন মতে ও আধুনিক মতে সমন্বয় করিয়া আনন্দ লাভ কর, কালি সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। ....প্রাচীন দার্শনিক মতের সংগে আধুনিক বিজ্ঞানের মতের কোন বিরোধ নাই, এ কথাও ঠিক। কিন্তু প্রাচীন মতের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে গেলে ওরূপে সমন্বয় করিতে গেলে চলিবে না।"৯ ব্যবহারিক জগতের সংগে পারমার্থিক জগতের যে সম্পর্কসূত্রের ব্যাখ্যা তিনি করেছেন, তা গভীর মনন-শীলতা, সৃষ্টিরহস্য-অনুসারী সুনিপুণ বিশ্লেষণ এবং জাগ্রত বুদ্ধির পরিচায়ক। সাহিত্য ও ধর্মের সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্যতা বিষয়ে তাঁর অপর একটি তত্ত্বনির্ণায়ক প্রবন্ধ 'চরিতকথার' (১৯১৩) 'মহর্ষি

৯ পঞ্চভূত : জিজ্ঞাসা

দেবেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি। রামেন্দ্রসুন্দরের এ বিষয়ে নিজস্ব মানসিকতার উপরেও প্রবন্ধটি আলোকপাত করে।

এইভাবেই যুক্তি ও বিজ্ঞানের দ্বারা রামেন্দ্রসুন্দর ধর্মপ্রসঙ্গ ও তত্ত্ববিষয়কে ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যার মনোজীবনটি গড়ে ওঠার পশ্চাতে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে যুগ ও জীবনের এই ধারা সক্রিয় ছিল। প্রতিভার স্বয়ংস্বতন্ত্র উদ্ভাসে একদা তিনি 'দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা' ১০ রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছিলেন (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি) ; তাঁর এই প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে প্রস্তুত করে তুলেছিল বিগত কালের চিন্তানায়কদের পদচিহ্নের অনুসরণ।

মানবসভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক পর্বেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা দার্শনিক চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। দর্শনের যে অংশের সংগে ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কিত—তা অনেকাংশেই পুরাণাশ্রয়ী হয়ে গড়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সংগে পৌরাণিক চিন্তার মূলগত বিরোধ চিরকালীন। ধর্মের যেটি আধ্যাত্মিক দিক তার সংগে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক বা বিরোধ নেই। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতির সংগে প্রাচীন দর্শন সমূহের অন্যতম বেদান্তের গভীর মিল রয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারে বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি খণ্ডিত হয় না। রামেন্দ্রসুন্দরের 'মুক্তি' প্রবন্ধটি এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রমাণবহ। এ ক্ষেত্রে রামমোহন, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তমিশ্র বিজ্ঞানের সমন্বিত রূপটি স্মরণীয়। রামেন্দসুন্দরের দৃষ্টিভংগীর সংগে এই তিনজন মহামনীষীর বেদান্ত চিন্তা সূত্রেয় সম্বন্ধে স্মরণ করা প্রয়োজন।

ঊনিশ শতকের বেদান্ত চিন্তার ধারায় ব্রাহ্মসমাজে যে বৈদান্তিক চিন্তার আদর্শ গৃহীত হয়েছিল—বেদান্তের ভিত্তিতে মানবীয় ইহজীবন ও

---

১০ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর : নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত

সংসার জীবনকে গ্রহণ করাই ছিল সেখানে মৌল আদর্শ। বেদান্ত-বাদী হয়েও ব্রাহ্মরা ছিলেন তথাকথিত বৈরাগ্য বিরোধী। রামেন্দ্র-সুন্দরকে আমরা এই ব্রাহ্মচিন্তাধারারই উত্তরাধিকারীরূপে চিহ্নিত করতে পারি। কর্মোদ্যমের, তর্কজটিল সেই যুগে বিজ্ঞান ও বেদান্তের সমন্বিত দর্শনে নিশ্চিতরূপেই রামেন্দ্রসুন্দর বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন। এই মনোভাবটি তাঁর জিজ্ঞাসার অন্তর্গত 'কে বড়' প্রবন্ধটিতে উল্লেখিত হয়েছে। মানুষ আপনার কল্পনার সমক্ষে নিজেকে ক্ষুদ্র কল্পনা করে যে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়েছে এবং কল্পনার পূজাতেই আত্মনিরত হয়েছে নিরঙ্কুশভাবে মানব ইতিহাসের সেই বিগত দিন-গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করে রামেন্দ্রসুন্দর নিঃসঙ্কোচে উচ্চারণ করেছেন ঃ "আপনার জীবনকে কাল্পনিক দুঃখের আধার ভাবিয়া সেই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের নিষ্ফল প্রয়াসে বিতাড়িত হইয়াছে। এমন দিন কি আসিবে না যখন এই মিথ্যা বিভীষিকা তাহার মনুষ্যত্বকে আর সঙ্কুচিত ও ম্রিয়মান রাখিবে না। এই কাল্পনিক মুক্তি প্রয়াস আর তাহাকে উন্মার্গগামী করিবে না। যখন মনুষ্য আপন মনুষ্যত্বের অর্থ বুঝিবে ; আপনাকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু বলিয়া জানিতে পারিবে। পূর্ণ মনুষ্যত্বে বলীয়ান মনুষ্যের কণ্ঠে 'সোঽহং' এই মহাবাক্য ধ্বনিত হইবে ; কিন্তু সেই মহাবাক্য মানুষ্যকে অতীতকালের মতো স্বার্থপর বৈরাগ্যের নামে চালিত না করিয়া হৃদিস্থিত অন্তর্যামী অভীষ্ট কর্ত্তব্যের পালনে নিযুক্ত রাখিয়া ব্যবহারিক মৃত্যুর ভয় হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া অভয় দান করিবে।" এই যে সুখবাদ বা দুঃখচেতনা বিবেকানন্দও বৈদান্তিকের দৃষ্টি নিয়েই তার বিচার করেছিলেন। সুখ-দুঃখ তত্ত্ব সম্বন্ধে কর্মযোগে ব্যক্ত বিবেকানন্দের মত হল এই যে, সুখৈকতাৎপর্যকে অজ্ঞের মত অনুসরণ করা অকর্তব্য। জগতের দুঃখের মূলীভূত কারণও এই সুখসন্ধ মনোভাব। রামেন্দ্রসুন্দর সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল পূর্ণ দ্বন্দ্ব পূর্ণ জগতে বিশ্বাসী। তাঁর মতে সুখদুঃখ "একই প্রস্রবণে, একই নির্ঝর ধারাতে উভয় স্রোতস্বতী জন্মলাভ করিয়াছে। একই সাগরে

উভয়ে গিয়া মিশিয়াছে। উভয়ই বা কেন বলিব? একই স্রোতস্বতী একই নির্ঝর হইতে বাহির হইয়াছে। এপার হইতে বলি সুখ, ও-পারে দাঁড়াইয়া বলি দুঃখ।" ১১

৩

নবমানবতার অভ্যুদয়ের যুগে স্বাধীন চিন্তার অঙ্কুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকেই গ্রহণ করেছিল। এ এক নুতন মূল্যবোধ। এ বিষয়ে একজন সমালোচক সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করেছেন :

"আমাদের দেশে মৌলিক বিজ্ঞান সাধনা ছিল না বটে, কিন্তু সমাজ গঠনের জন্য নীতি রচনার সাধনা ছিল। ব্রাহ্মসমাজ তখনকার দিনে রাজনারায়ণ বসু এবং কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে যে নৈতিক আদর্শের কথা বলেছিল, তাতেও প্রচ্ছন্ন ছিল, এদের প্রভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলাই বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষতাবাদকে তাঁর ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি তৈরীর কাজে ব্যবহার করেছিলেন।" ১

বঙ্কিমচন্দ্রের নবমূল্যবোধ কি ছিল? বিশ্বাশ্রয়ী মানুষের জন্যে এক নব আদর্শের ধ্যান। এ ধ্যানের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানর্চ্চার দিকে আত্যন্তিক প্রবণতা ছিল—আর তারই পটভূমিতে ছিল ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত একটা প্রবল অনুসন্ধিৎসা—বৃহত্তর দেশ ও জাতির আত্মিক স্বরূপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে 'মনুষ্য ধর্মের আদর্শ সৃষ্টি।' বাঙালীর ইতিহাসের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের আকুতি। 'নইলে বাঙালীর ভরসা নাই।' বক্তিত্ব-বাদের প্রবল চেতনাই বিবেকানন্দের উপলব্ধিতে ব্যক্ত হল—"The soul had never been bound. Believe that you are free and you will be."

বিংশ শতকে বাঙালী মননে এই যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধের প্রসার —এই যে মহাকর্মযোগ, পাশ্চাত্য চিন্তারীতির সংগে তার যোগ আছে।

১১ 'অমঙ্গলের উৎপত্তি'

১ বাঙালী মণীষার সংকট ও সমন্বয় : পূর্বাশা, ফাল্গুন ১৩৭০

বঙ্কিম মানসে এই চিন্তাচেতনার উন্মেষ ও প্রসার 'ধর্মতত্ত্বের' যুগেই আমরা লক্ষ্য করি। ১৮৮৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' রচনা করেন। সমালোচকপ্রবর মোহিতলাল মজুমদার এ বিষয়ে বলেছিলেন ঃ

"বঙ্কিমের দেশপ্রীতি মনুষ্যত্ব সাধানারই একটা অঙ্গ। সেই বৃহত্তর ধর্মেরই একটা বড় সাধন। ইহার মূল প্রয়োজন রাষ্ট্রিক নয়—সামাজিক সুলভ পরজাতি-বিদ্বেষ নয়—স্ব-জাতি-প্রীতিই ইহার একমাত্র প্রেরণা ; এমন কি, জগৎ-প্রীতি ও ভগবৎ-প্রীতিতেই তাহার শেষ পরিণতি।"

দেশ-প্রেমকে বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে ঈশ্বরভক্তির নীচেই স্থান দিয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়ে তিনি মুক্ত মনে অকুণ্ঠ চিত্তে উচ্চারণ করলেন ঃ

"আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজন রক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরাদিষ্ট কর্ম, কেন না, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়……বস্তুতঃ জাগতিক প্রীতির সংগে, আত্মপ্রীতি, বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই।….ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ! ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।" ২

---

২ ধর্মতত্ত্ব ঃ বঙ্কিমচন্দ্র

সংগঠক রামেন্দ্রসুন্দর

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল তাঁর গঠনশীল মনের সান্নিধ্যে—সে ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিসরে পরিব্যাপ্ত ছিল তাঁর উৎসাহ এবং প্রাণের পরিপূর্ণ উদ্যম। তাঁর এই সংগঠন ক্ষমতা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নানাভাবে পরিপূর্ণ প্রাণের জোয়ার এনেছিল। তাঁর প্রতিভার স্বভাবধর্ম এই বৃত্তিটির সঙ্গে বাংলা-সাহিত্যের প্রসারের ও প্রসারের জন্যে নানামুখী পরিকল্পনার একটি আত্মিক যোগ আছে। বিষয়টি ঐতিহাসিক কালানুক্রমের পটভূমিতে তথ্য ও তত্ত্ব সহ বিচার্য।

১৩১৪ সালের ১৭-১৮ কার্তিক কাশীমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের যে প্রথম অধিবেশন সুরু হয় তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক তখন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। এই সভায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধের মধ্যে তিনি বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের এক উজ্জ্বল প্রত্যাশার অভিপ্রায় প্রকাশ করে জনমনের দ্বারে তাঁর উদ্বেলিত চিন্তাধারাকে পৌঁছে দিলেন :

> "বাংলার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাঙালীর নাড়ীনক্ষত্রের পরিচয় পাই। সেকালের বাঙালী কিরূপে কাঁদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্মস্থলে কখন কোন স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা তাহার স্বপ্নের কথা, এই প্রাচীনসাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি। পৃথিবীর কয়টা জাতি এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে? যাহারা এতদিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের জন্য লজ্জিত হইতে হইবে না।"

দেশ ও জাতির 'উদ্দেশ্য ও কার্যের অনুকূল' এই জাতীয় চেতনার ক্ষেত্রেই রামেন্দ্রসুন্দর সংগঠক। তিনি চিন্তানায়ক।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৩১৪ সাল একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এই সালে পরিষদের মন্দির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় এবং ঐ সালেরই ১৭ই কার্তিক রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়। যে উদ্দেশ্যে সাহিত্য পরিষদের উদ্ভব, সেই উপলক্ষেই উদ্দেশ্যের অনুকূল প্রস্তাবগুলি সাহিত্য সম্মিলনীতে গৃহীত হয়েছিল। বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির যথাযথ সংরক্ষণের প্রয়াসরূপে 'সারস্বত ভবন' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েও দেশ-বাসীকে একপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হবার জন্যে আহ্বান জানানো হয়। পরিষদের গৃহ প্রবেশের উৎসবসভায় রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে দেশমাতার পুত্ররূপে সম্বোধন করেন এবং বলেন : "আমাদের দেশমাতাকে পুত্রবতী হইতে হইবে। এই পুত্রদের কেহবা দেশের জানবে, কেহবা দেশের ভাববে, কেহ বা দেশের কর্মকে অনুভূতি দান করিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, তাহারা নানা লোকের উদ্যমকে একস্থানে আকর্ষণ করিয়া লইবে, তাহারা নানা লোকের চেষ্টাকে একত্রে বাঁধিয়া চলিবে। তাহারা দেশের চিত্তকে নানা ব্যক্তির মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে এবং অনাগত কালের মধ্যে বহন করিয়া চলিবে। ....এইরূপ পুত্রের জন্যে বঙ্গভূমির কামনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে।....বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে আমি এইরূপ একটি পুত্র বলিয়া অনুভব করিয়া অনেকদিন পর্যন্ত আনন্দ পাইতেছি।"

বাংলাদেশের আত্মপরিচয়ের শক্তিকে সাহিত্য পরিষৎ ১ নিত্য-প্রসারিত করে দেবে এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল। সমস্ত দেশের

---

১ জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন :

"বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার পরিকল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বর্তমান সাহিত্য পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার সহিত সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোন অনৈক্য ছিল না।"

স্নেহ ও আশীর্বাদ এই প্রতিষ্ঠানের পরিপূর্ণতা আনুক রবীন্দ্রনাথ অসীম আত্মিক বিশ্বাসের সঙ্গে এই স্বাভাবিক প্রত্যাশা পোষণ করতেন। তাঁরই আকাঙ্ক্ষিত এই স্বপ্নের 'চিত্তযোগ-সাধক' প্রতিষ্ঠানের সমগ্র ভার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীই গ্রহণ করেছিলেন। সামাজিক মতের ও ব্যবহারের অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সংগে রামেন্দ্রসুন্দরের যোগাযোগ একটি গঠনশীল প্রত্যয় সৃষ্টি করেছিল। সেই প্রত্যয়কে রামেন্দ্রসুন্দর সর্বপ্রকার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কার্যে প্রয়োগ করেছিলেন। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (১৮৯৩ খৃঃ) গ্রে ষ্ট্রীটের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের গৃহে 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমী অব্ লিটারেচার' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ এর নাম বাংলায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ২ রূপে আখ্যাত হয়।

পূর্বতন নামে যখন এই প্রতিষ্ঠান পরিচিত ছিল, তখন তার কর্মধারা নিম্নরূপে নির্ধারিত হয়েছিল ঃ

১। একদিকে ইংরেজিসাহিত্যের ও অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন করে বাংলাসাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন।

২। প্রতি রবিবার 'অ্যাকাডেমি অব লিটারেচারে'র অধিবেশন হত—পরে পনেরো দিবস অন্তর সেই সভার অধিবেশন হত।

৩। অ্যাকাডেমির নামেই ইংরেজীতে প্রকাশিত একটি মুখপত্রে সভার কার্যবিবরণাদি প্রকাশিত হত।

প্রায় প্রতিষ্ঠা থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নানা গঠনমূলক কার্যকলাপের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করলেন এবং উচ্চ আদর্শবাদিতায় প্রতিষ্ঠানটিকে পুনর্গঠিত করবার দায়িত্বভার

---

২ উমেশচন্দ্র বটব্যাল এ প্রসংগে লিখিয়াছেন ঃ "বুদ্ধিবলে শ্রুতিকোমল বিশুদ্ধ আর্যভাগায় আপনাদের মিলিত অস্তিত্বের নামকরণ করিবেন।"

গ্রহণ করলেন। প্রথমেই তিনি 'সাহিত্য পরিষদ.পত্রিকা' প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। এই প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন ঃ

'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির পত্র হইবে, ইহা পরিষদের কার্যারম্ভেই নির্ণীত হইয়াছিল।....বিষয় ও প্রবন্ধ নির্বাচন বিষয়ে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালের অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। ইতিহাস পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে, অথবা যে সকল নূতন তত্ত্ব আলোচনাযোগ্য হইবে, তাহা যতই সংক্ষিপ্ত হউক না পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ....মুখ্যতঃ বঙ্গদেশ ও বাঙালীজাতি লইয়া সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বানুসন্ধান আবদ্ধ রহিয়াছে। এই সংকীর্ণ সীমামধ্যে ও পরিষদের বিশাল কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত রহিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষা কিরূপে উৎপত্তি ও পুষ্টিলাভ করিল, তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই; বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশই এখনও অনাবিষ্কৃত। জীর্ণ কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথিপত্রের ভিতর বাঙ্গালাদেশের সামাজিক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।............পুরাতন মন্দির ও জীর্ণ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের সহিত যে সকল পুরাতন কিংবদন্তী জড়িত আছে—তাহাই সংগ্রহ করিয়া, বাঙ্গালার লুপ্ত ইতিহাসের যথাসম্ভব উদ্ধার করিতে হইবে, মহিলাসমাজে প্রচলিত ব্রতকথা ইত্যাদি হইতে এবং সামাজিক পূজা-উৎসব-ক্রীড়া প্রভৃতির অভ্যন্তর হইতে অপিচ বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার রীতিনীতি হইতে বাঙ্গালী-জাতির সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইবে। প্রাচীন মুদ্রা শিলালিপি দলিল প্রভৃতি হইতে বঙ্গদেশের রাষ্ট্রগত ইতিহাস আবিষ্কার করিতে হইবে। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন

জেলায় প্রচলিত উপভাষা এবং অপভাষা আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গঠন প্রণালী নির্ণয় করিতে হইবে। এই সমুদয় ও আরও বৃহৎকার্য সাহিত্য পরিষদের প্রধান কর্তব্যমধ্যে রহিয়াছে। এই কর্তব্য সাধনে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাই সাহিত্য পরিষদের প্রধান মুখপত্র। ....সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সাহায্যে সর্ববিধ জ্ঞানপ্রচার এবং শিক্ষাবিস্তার করিবার চেষ্টা উপযুক্ত হইবে না, কারণ ইহা একটি তত্ত্বানুসন্ধিনী সভার মুখপাত্র। ইহা দ্বারা সেই সভার কার্যফল, গবেষণার ফল, অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করিতে হইবে।"

রামেন্দ্রসুন্দরের এই দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যেই তাঁর সংগঠক মনের ব্যাপ্তি ও প্রসারতার যথেষ্ট পরিচয় আছে। পরিষদ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হলে শেষ পর্যন্ত কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ভাড়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত হল। পরে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বদান্যতায় আপার সার্কুলার রোডে পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়। পরিষদের পঞ্চদশ বছরের কার্যবিবরণীতে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সংগঠক মনের উদার আহ্বান প্রচার করলেন ঃ

"জ্ঞানান্বেষিগণ এই মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া নবনব তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত রহিবেন, এবং দেশমধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা স্বদেশকে উন্নতমার্গে প্রেরণ করিবেন। অতীতকালের মহাপুরুগণের স্মরণ নিদর্শন সগৌরবে বহন করিয়া এই মন্দির বঙ্গবাসীমাত্রের তীর্থ স্বরূপে পরিণত হইবে।"

এই তীব্র আত্মপ্রত্যয় তাঁর অদম্য চরিত্রের অফুরন্ত শক্তিরই দ্যোতক।

২

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম পরিষদের সামনে আদর্শের মত ও পথকে আমার নির্দেশনায়

তুলে ধরেন। পরিষদের দ্বাদশ বার্ষিক বিবরণে এই বিষয়ে উল্লেখ পাই ঃ

> "জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যই জাতীয় ঐক্যরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। বঙ্গবিভাগের পর এই কথাটা অনেকের মনে স্পষ্টভাবে উঠিয়াছিল। এই বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাহিত্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্যসেবীদিগের মিলন সাধন এবং বাঙ্গালার প্রাদেশিক ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ও বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভে গত ভাদ্রমাসে টাউন হলে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি ঐ প্রস্তাব সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সাহিত্য পরিষৎকে ঐরূপ বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন করিতে অনুরোধ করেন।"

১৩১৪ সালের কার্তিক মাসে মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে রবীন্দ্রনাথের মূল সভাপতিত্বে যে সম্মিলন হয়, সেই সম্মিলনীর বিবরণীতে উল্লিখিত হয় ঃ

> "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, ইহা সর্বতোভাবে সঙ্গতই হইয়াছিল।....তাঁহারই নেতৃত্বে সাহিত্য সম্মিলন যে সুপথে চালিত হইয়াছে তাহা বলা আবশ্যক। সভাপতির অভিভাষণের পর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সাহিত্য সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।"

রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দেশকে নিজেদের আনুকূল্যে সচেষ্ট হবার জন্যে যে আহ্বান টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভাষণে প্রচার করেন—সেই প্রস্তব বাস্তবে রূপায়িত করার কালে বরিশাল ও রংপুর সাহিত্য সম্মিলনের জন্য পরিষদের

কাছে আবেদন এল। পুলিশের অত্যাচারে বরিশাল সাহিত্য সম্মিলন কোন ক্রমেই সেদিন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ষ্টার থিয়েটারে একটি মহতী জনসভা আহূত হয়েছিল। অত্যন্ত কঠোর-ভাবেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়। এই রাজনৈতিক পটভূমিকায় যোগক্ষেম রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে আহ্বান জানালেন 'পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখা স্থাপন করিতে হইবে।' উদাত্তকণ্ঠে তিনি আহ্বান করলেন ঃ "এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।' রবীন্দ্রনাথ সাংস্কৃতিক ঐক্যের ক্ষেত্রে পরিকল্পনাগত এক বিপ্লব নিয়ে এলেন রাখীবন্ধনের মধ্য দিয়ে। রামেন্দ্রসুন্দর যখন ১৩১২ সালে পরিষদের সম্পাদক, তখন বঙ্গভঙ্গের পট-ভূমিতে দেশীয় রাজনৈতিক অবস্থা বহ্নিমান। পরিষদের সহকারী সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ পরিষদের উপরে গুরু দায়িত্ব ভার অর্পণ করলেন। বাংলাদেশে ও বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্যকে পরিষৎ স্বদেশের প্রয়োজনেই কেন্দ্রবদ্ধ করেন এবং সমস্ত দেশব্যাপী বাঙালীকে জড়তার দাসত্ব পাশ থেকে মুক্ত করবার জন্যে বৃহত্তর কর্মভার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করলেন। সংগঠক রামেন্দ্রসুন্দর কবিঋষির আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং বর্ষে বর্ষে বঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করে বঙ্গের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দান করলেন—পরিষদের ১৩১২ সালের কার্য বিবরণীতে। এ ছাড়াও রামেন্দ্রসুন্দর নিজে সেই বঙ্গভঙ্গের জাতীয় সংকটের কালে একটি অভিনব সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেলেন। বঙ্গবিভাগের দিনটাকে জনসাধারণের মনে চিরজাগরূক করে রাখবার জন্যে তিনি ক্ষোভসূচক অরন্ধন দিবস পালন আহ্বান

জানালেন। এই অরন্ধন দিবসকে সামাজিক ব্রতানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করে দেন তিনি। রামেন্দ্রসুন্দরের কন্যা গিরিজা কর্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয়। এই বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের পরিকল্পনাটি নিম্নরূপ ঃ

"পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দুর লইবেন। হরিতকী ও সুপারী হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথাশেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বাম হস্তের প্রকোষ্ঠে স্বদেশী কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাখীবন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে পাটালি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসর কালে যথাসাধ্য বিদেশী, বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম আরম্ভের পূর্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন।"

আর সেই সঙ্গে বাংলার লক্ষ্মীর কাছে শপথ নিতে আহ্বান জানালেন ঃ

"মালক্ষ্মী কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। ভিক্ষার ধন হাতে তুলবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাবো। ভাইকে খাইয়ে নিজে খাবো। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক্। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকুন।"

বাংলাদেশের 'আত্মশক্তি বিস্তারক' প্রতিষ্ঠান সাহিত্যপরিষৎ সাহিত্য

সম্মিলনের 'শাখা সম্মিলন' প্রথম উদ্বোধন করলেন বাংলা দেশের বাইরে ভাগলপুরে (৩-১ ফাল্গুন, ১৩১৬) ভাগলপুরের এই পরিষৎ শাখায় সারদাচরণ মিত্র সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থেকে স্বরচিত গান গেয়েছিলেন। সভাপতির ভাষণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশনা ছিল ঃ

> "নেপোলিয়ান তাঁহার রাজত্বকালে অ্যাকাডেমী অব লিটারেচার স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া ফরাসী ভাষার অসীম উপকার করেন। সেই সভার ছায়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গঠিত। যাহাতে বঙ্গভাষার শুদ্ধি ও প্রসার হয়, যাহাতে কুরুচির বিচ্ছেদ ও সুরুচির সম্যক বিস্তার হয়,...তজ্জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ আবশ্যক।"

রবীন্দ্রনাথ এই সম্মিলনীতে 'নির্মাণকার্যে' সহযোগিতার প্রয়োজন বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন। এই সম্মিলিত শক্তিসঞ্জাত 'বড় ফললাভের মধ্যেই' যে 'প্রকৃত কর্মক্ষেত্র' তিনি তারই অভ্রান্ত নির্দেশ দিলেন। এই অধিবেশনেই পরিষদের 'রমেশ ভবন' বিষয়ক প্রস্তাবটি গৃহীত হল। এই প্রস্তাব বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যে কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর গঠনশীল মনের বৈচিত্র্যের পরিচয় লাভ করা যায় ঃ

> "রমেশচন্দ্রের ভারতব্যাপী বন্ধুগণ, যাঁহার কর্মক্ষেত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাঁহার সখা ছিলেন, গৃহে তাঁহার সুখদুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বতভবন, বঙ্গের সারস্বত ভাণ্ডার, বঙ্গের জাতীয় চিত্র-শালা যেখানে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদ্ঘাটিত করিবে, যেখানে বর্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোচিত হইবে, সেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশার ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রে চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পূজা পাইবেন, বঙ্গের লক্ষ্মী যেখানে আপন ঐশ্বর্য প্রকটিত করিবেন, সেই সরস্বতী ভবন, সেই রমেশ ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদিগকে

প্রার্থনা করিতেছে, অট্টালিকা নির্মাণ আমাদের অসাধ্য হয়, এখন কুটীর নির্মাণেই আমরা তৃপ্ত হইব।"

জাতি-সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নিগূঢ় কর্মশীল উদ্যমই যে সর্বার্থ-সার্থকতা আনতে পারে রামেন্দ্রসুন্দরের সংগঠনশীল কর্মধারাই তার প্রমাণ।

১৩১৩ সালে কলিকাতায় এক শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। বাংলা দেশের জাতীয় ইতিহাস সংকলন ও জাতীয় কীর্তিকলাপ সংরক্ষণের জন্যে 'সারস্বত ভবন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্মিলনীতেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তা বোধের মর্মস্থানকে আশ্রয় করবার জন্যে আহ্বান জানালেন ঃ

"যে প্রদেশে সাহিত্য পরিষদের সাংবাৎসরিক অধিবেশন হইবে প্রধানত সেই প্রদেশের উপভাষা, ইতিহাস প্রাকৃত সাহিত্য, লোকবিবরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও আলোচনা হইতে থাকিলে অধিবেশনের উদ্দেশ্য প্রচাররূপে সফল হইবে।"

সাহিত্যসম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন সুরু হয়েছিল ১৩১৯ সালে (৯-১০ চৈত্র) চট্টগ্রামে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে সভামণ্ডপের সম্মুখে এক 'সাহিত্য-প্রদর্শনী'র ব্যবস্থা হয়। এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। এই অধিবেশনেই প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুকে 'বিশ্বকোষ' সম্পাদনার জন্যে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। বাঁকিপুর সাহিত্য সম্মিলনে হল দশম অধিবেশন। এই বিষয়ে 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' গ্রন্থে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন ঃ

"বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বাঁকিপুরে সম্মিলনকে রেজেষ্টারী করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ সম্মিলনের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুমতি অনুসারে পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তৎলিখিত নিবেদনে এই সংবাদ জ্ঞাপন করায় রামেন্দ্রবাবু বিশেষ ব্যথিত হন। একমাত্র সাহিত্য পরিষদের ধাত্রীত্বগুণে এবং রামেন্দ্র-ব্যোমকেশের প্রাণপাত পরিশ্রমে যে

সম্মিলন আজ সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহার দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী কর্মকুশলতায় দেশের সাহিত্য ও সাহিত্য সমাজ উপকৃত, তাহাকে পরিষৎ হইতে স্বতন্ত্র করার সংবাদে রামেন্দ্রবাবু প্রাণে যে ব্যথা পাইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি ?"

সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির সাহায্যকল্পেও পরিষদ সক্রিয় ছিল। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে ধারাবাহিক লোকরঞ্জক বক্তৃতাদানের উপকারিতা প্রথম থেকেই উপলব্ধি করে পরিষৎ তা কার্যকর করবার চেষ্টা করেন। সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর চেষ্টায় ১৩০৬ সালে প্রথম ধারাবাহিক বক্তৃতার সূত্রপাত হয়। ১৩১৬ সালের ২রা আশ্বিন এই ধারারই একটি বক্তৃতা দান করেন রামেন্দ্রসুন্দর। সেটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 'মায়াপুরী'।

রামেন্দ্রসুন্দরের সংগঠক মনের দূরদর্শিতার আর একটি প্রমাণ হল রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পূর্বেই গুণীজন সংবর্ধনা দান। স্বদেশে কবির কাব্যপ্রতিভার ও যোগক্ষেম মনীষার উপযুক্ত সংবর্ধনা বিদেশী পুরস্কারের স্বীকৃতির পূর্বেই দিতে পেরে উত্তরকালে রামেন্দ্রসুন্দর আত্মিক গর্ববোধ করেছিলেন। জাতীয় জীবনে যাকে তিনি কল্যাণসূত্র বলে মনে করতেন তাকে কার্যে পরিণত করতে তিনি দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। এই জ্ঞানের মূলে ছিল আত্মজ্ঞান।

১৩২২ সালে পরিষদের সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ায় দ্বাবিংশতি বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে (২৩শে শ্রাবণ, ১৩২২) সহকারী সভাপতির সংখ্যা বাড়িয়ে চার থেকে আটজন করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সময়ে রামেন্দ্রসুন্দর সহকারী সভাপতি হন। সংগঠক রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত পরিষদের কর্মধারাকে আমরা নিম্নরূপে স্মরণ করে নিতে পারি :

সম্পাদক (১৩১১—১৩১৮)
সহকারী সম্পাদক (১৩২২) ১
পত্রিকাধ্যক্ষ (১৩০৬—১৩১০)

---

১ রামেন্দ্রসুন্দর বর্ষমধ্যে সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তাঁর স্থলে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন।

আয়ব্যয় পরীক্ষক (১৩০৪—১৩০৫)
কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য (১৩২০—২১)
পত্রিকাধ্যক্ষ (১৩২৪—২৫)
সভাপতি (১৩২৬)

পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের এই বিপুল কর্মধারার মধ্যে আমৃত্যু প্রতিজ্ঞার দৃঢ় সাক্ষ্য ছিল তাঁর কর্মশীল প্রতিভা ঃ

"আমি চিরজীবন পরিষদের সে·কের কার্য করিয়া যাইব ইহাই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা।"

রমাপ্রসাদ চন্দ বলেছিলেন—মহাপুরুষের অভাবের সময় উন্নতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার একমাত্র উপায় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য জাতি এ বিষয়টি খুব ভালো করে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সকলপ্রকার অনুষ্ঠানের পশ্চাতে এক জাতীয় সংঘ বা Institution গঠন করে থাকেন। সংঘের এই জাতীয় মহিমময় উপলব্ধি রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রাণেমনে প্রভাবিত করেছিল বলেই তিনি তাঁর আত্মার শক্তিকে সাহিত্য পরিষদের কর্মধারার মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন—সেখানেই তাঁর কর্মযোগী পুরুষত্ব—সেইখানেই তাঁর আপন দ্বিতীয় রূপ।

৩

সংগঠক রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভার আর একটি দিক স্বতোদ্ভাবিত ও বৈজ্ঞানিক রীতিতে আপন সৃষ্টিশীল সত্তার পরিচয়বহ। ১৩০১ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক পরিভাষার উপরে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। বিজ্ঞানে পরিভাষার প্রয়োজন, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার বিশিষ্টতা ও পরিভাষা নির্মিতি প্রসংগ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি সেখানে চিন্তা করেছেন। এই বিষয়ে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মন্তব্য স্মরণযোগ্য ঃ

"এই প্রবন্ধে তাঁহার যে বিচারক্রম ও ভাষাবিন্যাস দেখিতে পাই, তাহা পরবর্তীকালে রচিত তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থে ও প্রবন্ধেও বিদ্যমান।

আমার দৃষ্টিতে তাহার রচনার দুইটি লক্ষণ স্পষ্ট হইয়াছিল—(১) পরিভাষা সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই প্রচীনপন্থী, কদাচিৎ নবীনের প্রতি স্নেহশীল ; মনে হয়, যেন দুইটি বিপরীত শক্তি তাঁ ার মনের মধ্যে কাজ করিত। (২) তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় পাঠকের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত তিনি পুনরুক্তি করিতেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রবন্ধ মুদ্রিত করিতে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠা লাগিয়াছিল।"

মানুষের মনে যত কিছু ভাবের উদয় তা সীমাসংখ্যাতীত, কিন্তু আমাদের শব্দ সংকলন শক্তি সংকীর্ণ। এই সংকেত মাত্রাকে অবলম্বন করে আমাদের মনের অগণিত ভাব প্রকাশ করতে হয়। ফলে একই অর্থে আমরা পাঁচটা শব্দ ব্যবহার করে থাকি। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে ইহা নির্ধনের ধনবত্তার আড়ম্বর। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভূমি কর্ষণ করতে গিয়ে কৃষিযন্ত্রের সৌষ্ঠব অপেক্ষা কার্যকারিতার উপরে অধিক দৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। ভাষার পূর্ণতার ক্ষেত্রেও তিনি এই কার্যকারিতাকে বড় বলে মনে করেছেন। সংগঠক রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভার বিশিষ্ট একটি দিক 'শব্দ-কথা'র সন্ধানী ও বিশ্লেষণ নিপুণ মানসিকতার মধ্যে সংসক্ত।

'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমেই 'পরিভাষা গঠনের, বা প্রয়োগবিধির, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট তাৎপর্য বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। জ্ঞানবৃদ্ধির সংগে সংগে ভাষার পরিধি প্রসারও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তথাপি জ্ঞান প্রচারে যারা ব্রতী—বিষয়ের নিজস্ব গৌরববোধের ক্ষেত্রে তাঁদের সাবধান হয়ে চলতেই হয়। পাশ্চাত্য ঐশ্বর্যকে আত্মসাৎ করতে চাইলে জাতিগত কোন বৈরিতা নেই। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে আমাদের স্বজাতিকে যদি পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞান-সম্পদে সমৃদ্ধ করতে চাই তবে আমাদের মাতৃভাষাকে এরূপভাবে মার্জিত করে তুলতে হবে যেন 'তা বঙ্গভাষারই অঙ্গে নূতন রক্ত সঞ্চালিত করিয়া, তাহাকে পুষ্ট, সমর্থ পরিণত' করে তুলতে পারে।

জ্ঞানের ভাষার সংগে বিজ্ঞানের উন্নতির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সামর্থ্যের দিক দিয়ে বিজ্ঞানের ভাষাকে যে অন্যান্য প্রচলিত ভাষা থেকে

স্বতন্ত্র হ'তে হয় রামেন্দ্রসুন্দর সে বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চিত ছিলেন। বিজ্ঞানের উন্নতি নিঃসন্দেহে প্রতিভাসাধ্য—বিজ্ঞানের ভাষা সংগঠনও সেইরূপ প্রতিভা নির্দিষ্ট একটি ব্যাপার। গণিতবিদ্যার ভাষার সংগে পদার্থবিদ্যার ভাষার সংকলনে স্বতন্ত্র ও সূক্ষ্ম রীতির পার্থক্য অবশ্যই আছে। এই আবশ্যিক বিষয়টার উপর আপন ক্ষমতাকেও প্রয়োগ করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। এই জাতীয় শব্দচিন্তার প্রসংগে তিনি ভাষার ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনাও করেছিলেন ঃ

> "ভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রায় সর্বত্রই বিজাতীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনার চেষ্টা হইয়াছে। ইংরাজী ভাষা লাতিন-গ্রীক ফরাসী হইতে দুই হাতে ঋণ করিয়া আত্মপুষ্টি করিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষাতে আরবী-ফরাসী ও ইংরেজি শব্দ অজস্র পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সকল বিদেশীয় শব্দ এখন নিতান্ত আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই। ত্যাগ করিলে ভাষারই অঙ্গহানি ও শ্রীহানি হইবে মাত্র।" ১

'শব্দ-কথায়' শরীর বিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষাও তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। পিটার ব্রেটন সম্পাদিত A vocabulary of the Names of the Various parts of the human body.... ২ নামীয় গ্রন্থখানি তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে দেখবার জন্য নিয়েছিলেন। এই গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত বা বৈদ্যক পরিভাষা সংকলন করেছেন। সেই সংগে ইংরেজি পরিভাষিক শব্দগুলি ও তার সংস্কৃত প্রতিশব্দগুলিও তিনি তালিকাভুক্ত করেছিলেন। রাসায়নিক পরিভাষা সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি যথার্থ বুঝেছিলেন যে, বৈজ্ঞানিক

১ বৈজ্ঞানিকপরিভাষা ঃ শব্দকথা

২ গ্রন্থখানি ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতার গবর্ণমেণ্ট লিথোগ্রাফিক যন্ত্রে মুদ্রিত।

পরিভাষা প্রনয়ণের সময় প্রচলিত লৌকিক ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করতে হয়।

বিজাতীয় শব্দগুলির উচ্চারণ দুরূহতাকে বর্জন করতে হয়। পদার্থ সকলের ইংরেজি নামের ইতিহাস আলোচনা করে তিনি রাসায়নিক পরিভাষার কয়েকটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন ঃ

(১) কতকগুলি যৌগিক পদার্থ রসায়নবিজ্ঞানের উৎপত্তির বহু আগে থেকেই জনসমাজে প্রচলিত। তাদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় খাঁটি ইংরেজি নামই প্রচলিত।

(২) রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার পর যে সকল মূল পদার্থ নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে—তাদেরই কোন না কোন একটি গুণকে অবলম্বন করে নামকরণ।

(৩) কল্পিত ব্যাপার ও খেয়ালসম্ভূত নামসংকলন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিভাষা সমিতির সংগে সংশ্লিষ্ট থেকে এই বিষয়ে তিনি যে উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন—তাঁর 'শব্দ-কথার' মুখবন্ধে সে কথাই নিম্নরূপে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

> "কাগজ কলম হাতে লইয়া কোন একটা বিজ্ঞান বিদ্যার পরিভাষা গড়িয়া তোলা বৃথা পরিশ্রম। সুচারু পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচনাকর্তার ও অনুবাদকের হাতে। তবে প্রাচীন সাহিত্যে যে সকল শব্দের প্রয়োগ আছে, অথবা আধুনিক সাহিত্যে পূর্ববর্তী লেখকেরা যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার তালিকা দিলে এ-কালের লেখকদের কতকটা সাহায্য হইতে পারে।"

৪

বাংলা ব্যাকরণ বিষয়েও নানা তত্ত্ব তিনি তাঁর সংগঠনশীল মনের প্রবণতায় আলোচনা করেছিলেন। বাংলা ব্যাকরণ ঘটিত কয়েকটি প্রবন্ধ পরিষৎ সভায় একদা পঠিত হয়েছিল এবং পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই আলোচনায় অগ্রণী হয়েছিলেন

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ; রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা শব্দগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করে সে বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। সাহিত্যের 'সাধু' ভাষায় অপ্রচলিত সেই শব্দগুলি সেদিন গোঁড়া বৈয়াকরণদের প্রীতিঘন মনের স্বীকৃতি পায়নি। সেই 'উপস্থিত বিতণ্ডায় সাহিত্য পরিষৎ সম্পাদকেরও আত্মসমর্থন স্বরূপে কিছু বলা আবশ্যক বোধে রামেন্দ্রসুন্দর রচনা করেছিলেন 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধটি। এখানেই সাহিত্য রসিকের মতো তিনি চিন্তাশীল বিচার উপস্থিত করেছেন,

"সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা হইলেও উহার আর একটা উদ্দেশ্য আছে; উহাকে রসসৃষ্টি বলা যাইতে পারে। সাহিত্যের একটা অংশ আছে, তাহা সর্বসাধারণের জন্য নহে; উহা গুণীর জন্য ও অভিজ্ঞের জন্য ও কলাবর্তের জন্য ও সমজদারের জন্য।"

সাধুভাষার সুনির্বাচিত ও সুবিন্যস্ত শব্দরাজির মধ্যে যে ঐশ্বর্যের শক্তি আছে—ভাষার 'বলবিধানার্থ ও সৌষ্ঠব সাধনার্থ' তার গৌরব চিরদিনই থাকবে। কিন্তু খাঁটি বাংলা শব্দমাত্র দিয়ে ভাষার সর্বাঙ্গসুন্দর সৌষ্ঠব সম্পাদিত হতে পারে না—বিদেশী ভাষার আশ্রয় নিতে হয়। বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ছাড়াও অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় প্রচলিত—যেগুলিকে খাঁটি বাংলা শব্দ বলা যেতে পারে। প্রসংগক্রমে তিনি 'সাহিত্যের বাঙ্গালা' ও 'লৌকিক বাঙ্গালা' এই দুই জাতীয় ভাষার মধ্যে মিল ও অমিল বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ব্যাকরণশাস্ত্রও যে প্রকৃতপক্ষে একটা বিজ্ঞান, এটিই তিনি মূলতঃ প্রমাণ করেছেন। বাংলা ভাষাকে বিশ্লিষ্ট করে যুক্তির অণুবীক্ষণ যোগে তাকে ভালো করে যাচাই করে নিতে হবে—কোন শব্দকে এক্ষেত্রে অবহেলা করলে চলবে না।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যোমকেশ মুস্তফী রচিত 'বাঙ্গালা' কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রকরণ বিষয়ে প্রবন্ধটির সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে রামেন্দ্রসুন্দর ঐ নামীয় একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। প্রবন্ধটি

তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনের পরিচয়। রামেন্দ্রসুন্দরেরই অনুরোধক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালার অধ্যক্ষ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ 'বাঙ্গালা বিভক্তি চিহ্নে'র বহু দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। 'শব্দ-কথা'র কারক-প্রকরণের পরিশিষ্ট অংশে রামেন্দ্রসুন্দর তা প্রকাশ করেছিলেন (আশ্বিন ১৩২৩); রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর প্রণীত কারক প্রকরণে 'বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি প্রয়োগরীতি' নির্ধারণ করে কারক প্রকরণের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। 'ধ্বনিবিচার' নামক প্রবন্ধেও তিনি একটি মৌলিক বিষয়ে চিন্তা করছেন—'খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের বানানে এখনও কোন বাঁধা নিয়ম নাই, মনস্বী অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার শব্দকোষে সম্প্রতি নিয়ম বাঁধার চেষ্টা করিয়াছেন। এই বোধ করি প্রথম চেষ্টা।' বর্গের বিচারের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর দুরূহ বিষয়কে অত্যন্ত সরসভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। চলিত ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশিষ্টতাকে রামেন্দ্রসুন্দর যুক্তির নিরিখেই বিচার করেছেন।

১৩১২ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' পুস্তকটি প্রকাশ করতে উদ্যোগী হন। ঐ পুস্তকের প্রথমভাগের উপক্রমণিকায় তিনি লিখেছিলেন যে, বাংলা ভাষা শিক্ষা করা সহজ—কিন্তু বাংলা অক্ষর লেখা সহজ নয়—যুক্তাক্ষর লিখতে অযথা পরিশ্রম করতে হয়। সেই প্রবন্ধে তিনি সংযুক্ত অক্ষরকেই পরিষ্কার করে বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞজনের স্বীকৃতি তিনি সেদিন লাভ করেননি। একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দরই সেদিন তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সংযুক্তাক্ষরের 'আ-কার' পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন।

অসুস্থ ও ভগ্ন শরীরেও রামেন্দ্রসুন্দরের গঠনশীল মন ক্লান্ত হয়ে পড়েনি। তাঁর অসুস্থ অবস্থাতেই যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির কাছে এক অভিনব আবেদন পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি "বাংলায় এক এক বিষয়ের ছোট ছোট বই লিখিতে হইবে। কোন বই

১৫০ পৃষ্ঠার অধিক হইবে। দাম আট আনা। পাইকপাড়ার রাজা মহাশয় অরুণচন্দ্র সিংহ সে-সব গ্রন্থ প্রকাশের ভার লইয়াছেন। তাঁহার নিজের প্রেস আছে। এখন বই লিখিয়া যোগাইতে পারিলে হয়। এই নিমিত্ত এক সম্পাদক সংসদ করিতে হইবে।"

সংগঠনশীল মনের দিক দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন ধীশক্তির অধিকারী। আর সেই অনবদ্য শক্তির সংগে মিলিত হয়েছিল তাঁর জ্ঞান ও মননের যুক্ত সাধনা। এই সাধনার নানাপন্থী নির্দেশ আছে—'কর্মকথা'য়। তাঁর কর্ম চেষ্টা ও উদ্যমের মধ্যে ছিল চিত্তের সন্দীপক শক্তি।

রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর পরিষৎ ও সম্মিলন এই দু'য়ের মধ্যে সংযোগ সূত্র শিথিল হ'ল, চন্দননগর অধিবেশনে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সাহিত্য-সম্মিলনীর ভবিষ্যৎ পরিণতির এক শঙ্কাদীর্ণ মুহূর্তে কর্মবীর রামেন্দ্রসুন্দরকে স্মরণ করে বলেছিলেন ঃ

> "বিজ্ঞানকে ব্যাসকূটের পরব্যোম হইতে পৃথিবীলোকে অবতারণ করিবার জন্য আজ রামেন্দ্রসুন্দর কোথায়? 'After life's fitful fever' তিনি তো অনেক বর্ষ 'স্বর্গলোকে বিশালে' শান্তিসুখ উপভোগ করিলেন, এবার নামিয়া আসুন।"

———

রামেন্দ্রসুন্দরের 'প্রকৃতি'

'বিশ্বপরিচয়ে'র উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ একটি ছত্র ব্যবহার করেছিলেন—'বিজ্ঞান' থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী'। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর চিত্তের খাদ্য বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী নির্মোহ মানসিকতা থেকেই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষরূপে সংগ্রহ করেছিলেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বতত্ত্বকে বুঝবার ও বোঝাবার সেই সাধনাই রামেন্দ্রসুন্দরের 'প্রকৃতি' (১৮৯৬) গ্রন্থে বিশ্লেষিত হয়েছে। বিজ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তাঁর জীবনবোধকে সর্বপ্রকার মোহান্ধতার ঊর্ধ্বে এক যুক্তিবাদী মানসিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রথম সঙ্কলন গ্রন্থ 'প্রকৃতি'। ঊনিশ শতকে বৈজ্ঞানিক কয়েকটি আবিষ্কার চিন্তাজগতে বিপ্লব এনেছিল। বিজ্ঞানের নবাবিষ্কারে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কার্যকারণ ও পরম্পরাসূত্রে অন্তর্লীন কতকগুলি অস্তিত্বের সূক্ষ্ম প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল যার সম্ভাব্যতা পূর্বনির্দিষ্ট নয়। 'প্রকৃতি' গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানচিন্তা ও প্রয়োগরীতির মধ্যে সেই পাশ্চাত্য মানসিকতার পর্যবেক্ষণ-মূলক চিন্তা তুলনাত্মক রীতিতে পরিবেশিত হয়েছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে নির্দ্দিষ্ট কঠোর নিয়মের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত এবং প্রাকৃতিক বস্তুপুঞ্জ পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কঠোর নিয়মের অধীন—এ সমস্ত চিন্তাই বিজ্ঞানীদের মন ও মননকে পরিচালিত করেছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) একটি উল্লেখযোগ্য মতের প্রবর্তক, তাঁর মতে প্রাণীর যে যে অংশ তার জীবনধারণের আবশ্যিক প্রয়োজন—প্রকৃতি সেই সমস্ত গুণরাজির সংরক্ষক। এই গুণরাজির বর্তমানতা ও অভাব নিয়েই জীবজগতে প্রতিনিয়ত চলেছে দ্বন্দ্ব। এরই নিরিখে জীবজগতে

প্রকৃতির আনুকূল্যে ক্ষমতাহীনের বিলয়—ক্ষমতাবানের স্থিতি অর্থাৎ নির্মম 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'। জীববিদ্যার এই তত্ত্বটি রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রভাবিত করেছে এবং এই বৈজ্ঞানিক অমোঘ রীতিটিকে তত্ত্ব ও তথ্যের আশ্রয়ে, বিষয়নিষ্ঠ বিশ্লেষণী বুদ্ধির দীপ্তিতে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন 'মৃত্যু' নামীয় রচনাটিতে। এখানে ডারুইনের 'থিওরী'কে ব্যাখ্যা করে তিনি 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের' দুটি নির্গলিতার্থকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি জীবের আহারের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন 'কিন্তু পৃথিবীতে যত জীব আছে, তত আহার' নেই। আর সেই প্রসংগেই একটি সরস মন্তব্য করেছেন :

> "বোধোদয়ের প্রথম পৃষ্ঠে ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা এইরূপ নির্দ্দেশ আছে বটে ; কিন্তু জীবের সংখ্যা গণনা করিলে এবং খাদ্যের পরিমাণ ওজন করিয়া দেখিলে উক্ত বাক্যের যাথার্থ্যে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। এইরূপ গণনা ও ওজন করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ঈশ্বর যত জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের সকলের উপযোগী আহারের ব্যবস্থা করেন নাই।"

রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় বক্তব্য জীবজগতে সন্তানের মধ্যে পিতামাতা থেকে ভিন্ন কতকগুলি নতুন লক্ষণ দেখা দেয়। যেখানে এই 'নতুন লক্ষণ' অনুকূল—সেখানে নিশ্চিত স্থিতি এবং এইরূপে পুরুষানুক্রমে একটা বিশেষ লক্ষণ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া একটা বংশকে আর একটা বংশ হইতে পৃথক করিয়া তোলে,' এই প্রসংগে তিনি লামার্ক ও ডারউইনের তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। উভয়ের মধ্যে তিনি এক-বিষয়ে মিল ও একবিষয়ে পার্থক্য আবিষ্কার করেছেন। এক জৈবিক প্রক্রিয়ায় পিতার ধর্ম যে পুত্রে বর্তে এবং পৈতৃক ধর্মলাভের দিকেই যে জীবমাত্রের স্বভাবসংগত প্রবণতা রয়েছে এই বিষয়ে উভয়েই একমত। পৈতৃক স্বভাবধর্ম থেকে আগত গুণাবলী ছাড়াও জীবনের উপরে বহিঃপ্রকৃতির প্রভাববলে স্বোপার্জিত গুণকে যে নিজ সন্ততিদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে যায়—লামার্কীয় এই মতাদর্শ থেকে ডারুউইন কিছুটা

অন্যতর, তাঁর মতে পৈতৃক গুণ ব্যতিরিক্ত ‘কতকগুলি নূতন চিহ্ন’ তার সন্তানের মধ্যে দেখা যায়। এইগুলিকেই জীবনরক্ষার অনুকূল হতে হয়। জীবকে উন্নত ও অভিব্যক্ত করে তুলতে হয়। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর এই জাতীয় তুলনাত্মক রীতির মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেননি। স্বতোদ্ভাবিত চিন্তার বিশ্লেষণে মন্তব্য করেছেন :

> “ব্যক্তিবিশেষের জীবনরক্ষায় উভয়বিধ ধর্মই সাহায্য করিতে পারে কিন্তু বংশরক্ষায় ও জাতিরক্ষায় সহজ ধর্মগুলিরই প্রভাব পূর্ণমাত্রায়। কেননা, অর্জিত ধর্ম একপুরুষের পর পরপুরুষে যায় না ; সহজ ধর্ম পুরুষানুক্রমে চলিয়া যায়। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচন সহজ ধর্মের মধ্যেই কতকগুলিকে বাছিয়া লয়, ক্রমশঃ পুষ্ট ও পরিপুষ্ট করে এবং কতকগুলিকে ক্রমশঃ লুপ্ত করে।”

রামেন্দ্রসুন্দর শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনই উন্নতির সাধক। আর মৃত্যু জীবের সুনির্দিষ্ট পরিণাম। মৃত্যু জীবের আবরণ, শরীরের অর্জিত ধর্ম এবং এ আদেশ মান্য করতেই হবে। কেননা প্রকৃতির আদেশ অমোঘ :

> “বৃদ্ধ তোমার জীর্ণ আবরণ দেহ লইয়া তুমি সরিয়া যাও; বালককে সমর ক্ষেত্রে স্থান দাও। প্রকৃতির আদেশ পালন করিতেই হইবে।……প্রাকৃতিক নির্বাচনেই মৃত্যুর সৃষ্টি।”

প্রকৃতিতত্ত্বের মধ্যে এই মুখ্য বিষয়টিকে রামেন্দ্রসুন্দর নানা যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর ভাবসাধনার নিগূঢ়বাদী (mystic) দর্শনের অনুসারী একটি ছত্রে অধ্যাত্মবাদী অর্থময় স্বীকৃতি দান করেছেন :

> “জীব উৎপত্তির পর অবধি আর মরে নাই। সেই স্রোত যেদিন আরম্ভ হইয়াছে, সেদিন হইতে আর থামে নাই। পিতার মৃত্যু নাই ; পিতা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন মাত্র। শাস্ত্রের বাক্য এই অর্থে সত্য।”

ডারউনের চিন্তাধারার সচেতন প্রক্ষেপন আরও একটি প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায়—“প্রকৃতির মূর্তি”। তাঁর প্রতিপাদ্য হল ব্যক্ত প্রকৃতি—

অর্থাৎ গন্ধস্পর্শশব্দাদিময় নিজের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রতীয়মান প্রকৃতি। যার মধ্যে থেকে প্রকৃতির সংগে আমাদের সম্বন্ধ ঘটে—সেই মধ্যবর্তিতায় নিযুক্ত শক্তিটির নাম ইন্দ্রিয়। 'ইন্দ্রিয়' অর্থে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে একটি দার্শনিক প্রতীতিকে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন—'মনের সেই শক্তি, ধর্ম বা বৃত্তি যাহার বলে ঐ ঐ জ্ঞান উপার্জিত হয়, অথবা ঐ ঐ কর্ম সম্পাদিত হয় তাহাই বুঝিতে হইবে।' প্রসারে, পরিমাণে ও সূক্ষ্মতায় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক ইন্দ্রিয়বোধের পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য অনুযায়ীই প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ প্রতিভাত হয়। কিন্তু তথাপি মানুষের ধর্মবুদ্ধিতে বৈষম্য থাকলেও কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ে একটা সাদৃশ্য রয়েছে। এই সাদৃশ্যের বিজ্ঞানসংগত উত্তরের জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে'র উল্লেখ করেছেন। আর সেই সংগে রামেন্দ্রসুন্দরের যৌথ কল্যাণভাবনা-সমৃদ্ধ মন উচ্চারণ করেছে:

> "সাম্যে সম্মিলন, সম্মিলনে কল্যাণ, আর যাহাতে কল্যাণ, প্রাকৃতিক নির্বাচনে তাহারই অভিব্যক্তি।"

২

ভূবিদ্যাকে অবলম্বন করে জাগতিক রহস্যের কতকগুলি তথ্যকেও রামেন্দ্রসুন্দর 'প্রকৃতি' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। 'পৃথিবীর বয়স' প্রবন্ধে জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর দুই দলীয় সংশয়াচ্ছন্ন মতাবলম্বীর কথা উল্লেখ করেছেন:

> "একদল বলেন, মাতাঠাকুরাণীর বয়সের গাছপাথর নাই; আর একদল বলেন, জননীর জন্মগ্রহণ সে ত' কালিকার কথা। প্রথম দল চর্মের লোলতা ও ভগ্ন দন্তের সংখ্যা দেখিয়া বিচার করেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন, এই ত' সেদিন জননীর জন্য সূতিকাগৃহ নির্মিত হইতেছিল, সূতিকাগৃহের দেওয়ালে তাহার তারিখ লেখা দেখিতে পাইতেছি।"

কিন্তু এ জাতীয় হাস্যরসসমৃদ্ধ মন্তব্যের পরেই রামেন্দ্রসুন্দর গভীর ও গম্ভীর বিষয়ান্তরের আলোচনায় গেছেন। পূর্বোক্ত প্রথমদলীয় মতবাদীরা ভূবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যাকেই অবলম্বন করেছেন। অভিব্যক্তি-

বাদী রামেন্দ্রসুন্দর ভূ-তত্ত্ববিৎ ও জীবতত্ত্ববিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্তব্য করেছেন যে, ভূ-অভ্যন্তরে স্তরনির্মাণপদ্ধতি কোটি কোটি বৎসর ধরে ধীরভাবে চলছে এবং 'বিগত কোটি কোটি বৎসর মধ্যে অঙ্গহীন অচেতন জীবাণু হইতে অভিব্যক্তির ধারানুসারে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে।' ভূ-তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ববিদের এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের মতে স্যার উইলিয়ম টমসন্ একটা 'বিষম খটকা' এনে দিলেন। তাঁর মতে পৃথিবী বর্তমান অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। তখনও যে পৃথিবী জীবাধিবাসের উপযুক্ত হয়েছিল—এ বিশ্বাসে তিনি বিশ্বাসী নন। এই সংশয়ের উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। পৃথিবীর আবর্তন, পৃথিবীকে সূর্যের তাপদান এবং সেই তাপের কিয়দংশ নিয়ে নদনদী-জীবের উৎপত্তি ও লীলাখেলা এবং তপ্তপিণ্ডমাত্র পৃথিবী থেকে দিগন্তে বিকীর্ণ হওয়া তাপ ইত্যাদি প্রসংগের আলোচনা করেছেন। শেষপর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্তকেও রামেন্দ্রসুন্দর সুচিন্তিতরূপে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

> "ভূপৃষ্ঠের স্তরবিন্যাস, জীবের উদ্ভব, জীবপর্যায়ে উন্নতি এই সমুদয় ব্যাপার হয়ত কয়েক লক্ষ বৎসর মাত্রেই ঘটিয়াছে।"

এইজাতীয় সংশয় ও বিশ্বাসের তথ্যভিত্তিক তুলনামূলক আলোচনা রামেন্দ্রসুন্দর করেছেন এবং এক্ষেত্রে যে 'আরও ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক' সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে মতদান করেছেন। শেষপর্যন্ত তিনি বিরোধী বৈজ্ঞানিক-চেতনাকে এক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আহ্বান জানিয়েছেন ঃ

> "আশা করা যায়, অচিরকালে ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান পদার্থ বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া মিটমাট করিয়া ফেলিবেন। আমরাও তখন জননী বসুন্ধরার বয়সের তথ্য কতকটা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইব।"

'প্রলয়' নামীয় রচনায় প্রারম্ভিক ছত্রেই লেখক একটি কৌতূহলের অবতারণা করেছেন "বাল্যকালে একদিন পিতামহীর নিকট শুনিতে

পাই, পৃথিবী এক সময়ে উলটাইয়া যাইবে। সে-দিন ভাল নিদ্রা হইয়াছিল কিনা স্মরণ নাই।”

প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রাকৃতিক ব্যাপার প্রলয়তত্ত্ব। রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমেই বলে নিয়েছেন যে যেহেতু আমরা পৃথিবীর অধিবাসী—অতএব অন্য লোকের কথা ছেড়ে দিয়ে ভূলোকের কথাকেই তিনি প্রথম বিবেচ্য বলে বোধ করেছেন। আমাদের পৃথিবী সৌরজগৎরূপ একটি পরিবারের অন্তর্গত। সূর্যমণ্ডলকে মধ্যে রেখে যে ক'টি ছোটবড় গ্রহ বহুকাল ধরে বেড়াচ্ছে—পৃথিবী তন্মধ্যে অন্যতম। এ প্রবন্ধে ‘প্রলয়’ শব্দটিকে তিনি কোন দার্শনিক অর্থে প্রয়োগ করেননি—প্রলয়ের বিজ্ঞানানুমোদিত যুক্তিপারম্পর্য গ্রথিত মতের ব্যাখ্যা করেছেন।

৩

বিজ্ঞান পরিশীলিত বুদ্ধি ও মনন দ্বারা রামেন্দ্রসুন্দর ‘প্রকৃতি’ গ্রন্থে জ্যোতির্বিদ্যামূলক কয়েকটি প্রবন্ধও রচনা করেছেন। সৌরজগত-কেন্দ্রিক তাঁর নিজস্ব চিন্তাচেতনার মূল্যায়ন তিনি নিজেই করেছিলেন একটি প্রবন্ধে ঃ

> “প্রভাবে ও প্রবীণতায় জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞান রাজ্যে গরীয়সী। নিউটনের অলৌকিক ধীশক্তি সৌরজগতের জটিল শৃঙ্খল একেবারে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল ; গ্রহ বল, উপগ্রহ বল, ধূমকেতু বল, আর সমবেত উল্কাস্রোত বল, সৌরজগতে এমন কিছুই নাই, যাহার গতায়াত জ্যোতির্বিদের গণনায় না আইসে।”১

আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষ কতদূর অগ্রসর হয়েছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রারম্ভেই রামেন্দ্রসুন্দরের অতীত-ঐতিহ্য প্রিয় শ্রদ্ধাবান মন স্বীকার করে নিয়েছে ঃ

> “প্রাচীনকালের অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ ও প্রাচীনকালের জ্ঞানার্জন পন্থার সহিত আমাদের অধুনাতম জ্ঞানের পরিমাণ ও

---

১ জ্ঞানের সীমানা ঃ প্রকৃতি

জ্ঞানার্জন পন্থার তুলনা করিলে পদে পদে শোচনীয় অধঃ-পতনেরই পরিচয় পাওয়া যায়।"

'প্রাচীন জ্যোতিষ' প্রবন্ধটিতে রামেন্দ্রসুন্দর জ্যোতিষশাস্ত্রের 'মূল কথা' মাত্রকেই বিবৃত করতে চেয়েছেন। প্রথমেই তিনি পৃথিবীর আকার, ভূগোলপৃষ্ঠে বিবিধ কল্পিত রেখার অবস্থিতি ও দূরত্বনির্দেশ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানের অবস্থান নির্দেশের জন্যে সেই স্থানের অক্ষাংশের অবধারণ বিষয়েও আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি পৃথিবীর আয়তন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তৃতীয় আলোচিত বিষয় হল 'গতি'। গ্রহগণের অবস্থিতি কিরূপে নির্ণীত হত রামেন্দ্রসুন্দর উদাহরণ দিয়ে তা' স্পষ্ট করে বোঝাতে চেয়েছেন। 'প্রাচীন জ্যোতিষ' বিষয়ক প্রস্তাবে জ্যোতিষ্কগণের দূরত্ব নির্ধারণকে তিনি জ্যোতির্বিদ্যার একটি প্রধান সমস্যা বলে অভিহিত করে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। 'চন্দ্রের উদয়কালীন লম্বন' নির্ধারণ করে একদা দূরত্বের পরিমাণ নির্ধারিত হোত। আর পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ জানা থাকিলেই 'চন্দ্রের দূরত্ব আপনা হইতে আসে।'

সৌরজগতের বিশিষ্ট পরিবারের পরিচয় দান করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর 'সৌরজগতের উৎপত্তি' নামক রচনাটিতে। তিনি স্বল্প কথায় 'সৌরজগতের উৎপত্তি' বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা দান করেছেন।—'সূর্যকে বেষ্টন করিয়া বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনস, নেপচুন এই আটটি বড় বড় গ্রহ এবং বহু শত ছোট ছোট গ্রহ স্ব স্ব পথে নির্দ্দিষ্ট বেগে ভ্রমণ করিতেছে। আবার বৃহত্তর গ্রহ কতিপয়ের পার্শ্বে কতকগুলি উপগ্রহ নিয়মিত পথে ঘুরিতেছে। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ধূমকেতু ও উল্কাপুঞ্জ সূর্যের চারিদিকে ভ্রমণশীল। এই গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ও উল্কাপুঞ্জে বেষ্টিত সূর্যকে লইয়া জগতের যে অংশ তাহারই নাম 'সৌরজগৎ। সূর্য ইহার কেন্দ্রস্থ।" সৌরজগতের গঠনের বিশিষ্ট ভাব আলোচনা করে, এবং সৌরপরিবারের

জ্যোতিষ্কদের অবস্থা পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তকে পদার্থবিজ্ঞানের কতকগুলি তত্ত্বের সাহায্যে তিনি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন।

'ক্লিফোর্ডের কীট' প্রবন্ধে লেখক মানুষের একটি চিরপরিচিত সত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। সে সত্যটি হোল, 'আকাশ অসীম'। 'আকাশ' অর্থে তিনি সংশয়াচ্ছন্ন অর্থব্যাখ্যার পরিপোষক নন—তাই তিনি প্রথমেই বিষয়টি নিয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন :

> "ইংরেজিতে যাহাকে space বলে, সেই অর্থে আকাশ বলিতেছি। এখানে আকাশ অর্থে কেহ যেন শূন্যব্যাপী আলোকবাহী ইথর না বোঝেন। এই সত্যটার সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় ছিল না। আকাশের কি আবার সীমা আছে? আকাশের আবার কি পরিধি আছে?

মানুষের নানাবিধ দৃঢ় বিশ্বাসের মূলে সবলে আঘাত করেছিলেন ইমানুয়েল কান্ট। কিন্তু তিনিও একটা আনুগত্য দেখিয়েছেন এই সংস্কারের প্রতি। আকাশের অসীমতা নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচলিত দীর্ঘচ্ছন্দ কত বক্তৃতাকে তিনিও আঘাত করতে সাহসী হননি। কিন্তু এই সত্যটার শরীরেও আঘাত হানতে চেয়েছে কে? রামেন্দ্রসুন্দরের মতে ক্লিফোর্ডের কীট। প্রসংগক্রমে লেখক একটি সরস মন্তব্য করেছেন—"এই কীট মানুষের জ্ঞাতিমধ্যে গণ্য নহে।" এই কীট দৈর্ঘ্যমাত্রসার। এই বিস্তারহীন জগতে সে তার বিস্তারহীন শরীর নিয়ে সঞ্চরণ করে বেড়ায়। মানুষেরই মতো সে বুদ্ধিশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির অধীন। তার গতায়াত একটী স্বকৃত বৃত্তপথেই চালিত। তার দৈর্ঘ্যমাত্রসার বৃত্তপথের পরিধি ছাড়াও যে আর একটী বিশালতর জগৎ আছে—যে জগতে চন্দ্রসূর্যের প্রবলতর বিধান সক্রিয়—সে সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। লেখকের সরস সিদ্ধান্তের মতে 'সে চিরজীবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার সংকীর্ন সীমাবদ্ধ বিহারভূমির শেষ সীমা না পাইয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে সিদ্ধান্ত করে যে, তাহার জগতের সীমা নাই।' রামেন্দ্রসুন্দর মানুষের সংগে ক্লিফোর্ডের আন্তরিক স্বভাবের একটা মিল দেখিয়েছেন এবং বলেছেন 'ক্লীফোর্ডের কীটও ত আমাদের

অস্তিত্ব'। আমাদেরও সীমাবদ্ধ মনোবৃত্তির প্রকাশস্থল এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞান সসীম জগৎকে অসীম ভেবে আস্ফালন করছে।

'প্রাকৃত সৃষ্টি' প্রবন্ধে 'আদি—আদির ও পূর্বে' আমাদের প্রাকৃতিক ইতিহাস কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে লেখক বিজ্ঞান নির্ভর আলোচনা করেছেন। বিষয়টিকে তিনি নিম্নরূপে প্রতিপাদ্য করেছেন ঃ

> "আদিতে কি ছিল ? যতদূর অনুমান হয়, জলও নহে, আগুনও নহে, বোধ হয় বায়ু আর বায়ু, হইতে পারে তৎপূর্বে ছিল আকাশ আর আকাশ। আজকাল আধুনিকেরা বায়ু লইয়াই আরম্ভ করেন।"

এই প্রবন্ধে জগৎশৃঙ্খলের জটিলতম গ্রন্থির ব্যাখ্যা তিনি করতে চেয়েছেন। প্রসংগক্রমে বিজ্ঞানসম্মত উপযুক্ত তথ্যের সংগে সংগে বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত মত ও মতবিরোধিতা নিয়েও আলোচনা করেছেন। প্রকৃতিসংক্রান্ত প্রবন্ধের মধ্যে তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণেরই অনুবর্তী।

৪

রামেন্দ্রসুন্দরের 'প্রকৃতি' গ্রন্থের কেন্দ্রীয় প্রবন্ধ—'জ্ঞানের সীমা।'

জ্ঞানের পরিধির বিস্তার ঘটেছে এ কথা ঠিক। মানুষের মনোরাজ্যে সে যে স্থান অধিকার করেছে—তা নিয়ে মানুষের অহংকারের সীমা নেই। কখনও সে ভাবে 'সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটা বুঝি অতি শীঘ্র মানুষের বিজয়লব্ধ জ্ঞানরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।' এই তথাকথিত জ্ঞান বিষয়েই রামেন্দ্রসুন্দর আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন এবং নিজস্ব চিন্তা-চেতনার সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। নিউটনের কল্যাণে আমরা জগতের স্থিতি ও গতির কথা জেনেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যা অকল্পিত বেগে প্রসার লাভ করেছে। পদার্থবিদ্যার পর জীববিদ্যায় আমরা 'জড়শক্তিরই বিকাশমাত্র' কে বুঝি। বিবিধ জড়-শক্তির সুনিয়ত ক্রিয়ার পারম্পর্যে জীবের জীবনতত্ত্বকে বোঝানো চলে। কেননা লেখকের মতে ঃ

"বাহ্য ও আভ্যন্তরিক জড়শক্তিনিচয়ের তদনুযায়ী সামঞ্জস্য

প্রয়াসই জীবন ; সেই সামঞ্জস্যের নাশই মৃত্যু ; জীবকোষের সমবেত জীবনই জীবের জীবন।”

জীববিদ্যা জীবের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করে, রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, সমাজ-বিদ্যার সৃষ্টি করেছে, মনোবিজ্ঞান গঠন করবার কৌশল দেখিয়েছে, আবার নীতিশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের মূল ভিত্তি স্থাপনেও সহায়তা করেছে। এজাতীয় মত প্রতিষ্ঠায় রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। পরিশেষে তিনি জগতের স্বরূপ নির্ণয় প্রসংগে মন্তব্য করেছেন ঃ

“জড়বাদী উপহাসাস্পদ হইয়াছে। আত্মবাদীর মিথ্যা কল্পনা নিরস্ত হইতে চলিয়াছে ;...চিৎ কি তাহা জানিনা ; আবার জড় কি তাহাও জানিনা। বিজ্ঞান নিজের অজ্ঞান স্বীকার করিয়া তত্ত্বদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে।”

কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির কাছে আত্মিক সমর্পণেরই স্বীকৃতি জানিয়েছেন ঃ

“জড়জগতের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র। এই কল্পনা জীবনরক্ষার একটা উপায় বা কৌশল। প্রকৃতি করাইতেছেন, তাই যথা নিযুক্তবৎ করিতেছি।”

রামেন্দ্রসুন্দরের এই বক্তব্যের মধ্যেই তাঁর পরবর্তী ‘জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থের দার্শনিক ভাবনাপুষ্ট প্রবন্ধধারার সংকেত নিহিত। তাঁর বৈজ্ঞানিকতা-জীবি বিজ্ঞানভিক্ষু বৃত্তি ‘প্রকৃতি’ গ্রন্থেই একটা নবতর সৃজনপথের সন্ধান-তৎপর।

বিশ্বপ্রকৃতির বহু তত্ত্ব ‘প্রকৃতি’ গ্রন্থে রামেন্দ্রমানসকে আকৃষ্ট করেছে এবং তিনি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের পন্থানুসরণে নিজস্ব প্রগতিশীল চিন্তাকে আপন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। বিষয়ের জটিলতা তাঁর স্বভাবকুশল কৌতুকরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে উঠেছে। যুক্তির শৃঙ্খলা ও ক্রমবিন্যাসের মাধুর্য রামেন্দ্রসুন্দরের ধ্যান-সুন্দর মনকেই উদাহৃত করে দিয়েছে।

'জিজ্ঞাসা'র আলোকে রামেন্দ্রসুন্দর

'বিশ্বভারতী পত্রিকায়' ১৩৬০ সালে (বৈশাখ-আষাঢ়) যোগেশ চন্দ্র রায়বিদ্যানিধি একটি প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভা বিশ্লেষণ প্রসংগে 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪) গ্রন্থটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছিলেন :

"তাঁহার 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয়, তিনি প্রকৃতির বিজ্ঞান হইতে সার সংগ্রহে আনন্দ পাইতেন। তিনি যখন এই সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তখন এই সকল বিষয়ই বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। সে সময়ে আমারও অনেক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এই প্রকার ছিল। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন বিজ্ঞান বুঝি দর্শনের বিরুদ্ধধর্মী। কিন্তু বিজ্ঞানই দর্শনের প্রথম সোপান এবং দর্শনই বিজ্ঞানের পরিণতি। রামেন্দ্রসুন্দরে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রথম সোপান এবং দর্শনই বিজ্ঞানের পরিণতি। রামেন্দ্রসুন্দরে বিজ্ঞান ও দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল।" ১

দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের মধ্যে একটা বিপুল প্রাণপ্রৈতি আবিষ্কার করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর এবং এই সূত্রের মাধ্যমেই তিনি তাঁর সামগ্রিক চিন্তা প্রবাহকে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটিতেই রামেন্দ্রসুন্দরের সৃষ্টি সত্তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব উদ্‌ঘাটিত। প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের সংগে দার্শনিক প্রতীতিমূলক আত্মসাক্ষাৎকারের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এখানে রামেন্দ্রসুন্দর। আবার একটি সদাজাগ্রত সাহিত্যিক বোধ রচনাগুলিকে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন-শাস্ত্রে পরিণত করেনি—নিঃসন্দেহে রসের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। আর সেই সংগেই প্রতিটি প্রবন্ধের মতামত বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিশ্লেষণ দিয়ে শাসিত—দার্শনিক উপলব্ধি দিয়ে স্বয়ংবৃত। এই উপলব্ধিই

---

১ 'বিশ্বভারতী পত্রিকায়' (বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭১) প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের পরিণত মননের পরিচয়—আর এই পরিচয়ের আলোকে 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটি তাঁর সৃষ্টিসত্তার বিপুলতার মধ্যেও একটি পরমতম নির্জন উপলব্ধির বোধে ও প্রকাশে উজ্জ্বল।

'দার্শনিক চিন্তার' মধ্যে একটি ব্যাপক অর্থের বিস্তৃতি আছে। ভারতীয় দর্শনাচার্যগণ এই বিশিষ্ট অভিধাটির মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞানমূলক সাধনশাস্ত্রকেই বুঝতেন, এই প্রসংগে মন্তব্য করা হয়েছে :

> "আত্মা বা অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের সাধনশাস্ত্রই দর্শন, অন্য বিষয়ে জ্ঞানের নাম প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।" ২

রামেন্দ্রসুন্দরের দর্শনের স্বরূপ নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিক—তবে তা পারমার্থিক-তত্ত্বের সংগে প্রত্যক্ষত যুক্ত নয়। তাঁর নিজস্ব যে জাতীয় ভাবনা এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—তার মধ্যে য়ূরোপীয় সংশয়বাদের প্রতিরূপের সন্ধান মেলে।

এসম্বন্ধে বিশিষ্ট সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> "য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর Nature এবং Law-র আরাধ্যতার ফলে যে সংশয়বাদ এসে গিয়েছিল, আমাদের সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় পাই তারই প্রতিরূপ।" ৩

বস্তুজগতের ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার আশ্রয়ে তিনি যে রহস্য উদঘাটন করতে চেয়েছেন—সেখানে এক কার্যকারণসূত্রকে তিনি ব্যাখ্যাত্মক রূপ দান করেছেন—এ এক অভিব্যক্তির তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মধ্যেই তিনি দেখতে পেয়েছেন : 'জগতের নিয়মের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা আছে তাহার আত্মা সুস্থ, বলিষ্ঠ ও সামর্থ্যবান।'

জগতের বা প্রকৃতির এই দৃঢ়ীকৃত শক্তি ব্যক্তিমানুষের পরিচয়ের তুলনায় নগণ্য—তথাপি আত্মিক বলের সামর্থ্যে সেই বিপুল দৃঢ়ীকৃত শক্তিকে সর্বতোভাবে অন্তরের মধ্যে আত্মলীন করে নিতে হয়। একটি প্রখর যুক্তিবাদকেই রামেন্দ্রসুন্দর গ্রহণ করেছেন।

২ তত্ত্বজিজ্ঞাসা : ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র : ভবতোষ দত্ত,

আবার এই জাতীয় রহস্য জিজ্ঞাসার অনুধ্যানে তাঁর বিপুল জিজ্ঞাসাকে তিনি অবিচল বিশ্বাসে দর্শনেরও সমীপবর্তী করেছেন। এবিষয়ে তিনি সচেতন ঃ

> "বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েই জাগতিক রহস্যঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু উভয়ে ঠিক এক পথে চলে না, কাজেই বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি হইতে দার্শনিক অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র। দার্শনিক সৃষ্টিকে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির সহিত মিলাইতে গেলে চলিবে না।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞ রামেন্দ্রসুন্দর দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন—সেই সামঞ্জস্যের মূল্যমানের মধ্যে যেমন বুদ্ধিবৃত্তির নির্দিষ্ট পরিচালনা আছে, তেমনি ব্যক্তির বিশিষ্টতাকে তারই মধ্য দিয়ে 'personal equation' রূপে চিহ্নিত করেছেন। আবার নিয়মতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে ভাবতান্ত্রিক স্বভাবচর্যার মধ্য দিয়ে দর্শনের আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন। 'জিজ্ঞাসা'য় রামেন্দ্র-প্রতিভা এই জাতীয় দুর্লভ সমন্বয়েরই ভাবনায়ক, এখানে রামেন্দ্র-সুন্দরকে বিবেকানন্দের 'রাজযোগী' অভিধায় আখ্যাত করা যেতে পারে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ

> "রাজযোগ-বিদ্যা সত্যলাভ করিবার প্রকৃত কার্যকর ও সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী,...তবে বৈজ্ঞানিকগণ নানাবিধ যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়া উহাদের সাহায্যে যেমন বহির্জগতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থগুলি বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হন, রাজযোগীও সেইরূপ একটি স্বতন্ত্র যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সমূহ পর্যবেক্ষণ করিতে উদ্যত হন, ঐ যন্ত্র তাঁহার মন।" ৪

রামেন্দ্রসুন্দরের সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব আপন মনন শক্তি দ্বারা 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে বিজ্ঞান ও দর্শনের যোগসূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন—'চিত্তের বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চ্চা' এ গ্রন্থে তীক্ষ্ণ মনীষার সংগেই বিশ্লেষিত হয়েছে।

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (১ম খণ্ড) পৃঃ ৪৪৩

২

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি' (১৮৯৬) তে বিজ্ঞানচিন্তারই সর্বময় পরিণতি। এ সময়ে তাঁর মনোজীবনে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক গবেষকদের বিচিত্র আবিস্ক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটেছে। 'প্রকৃতি'গ্রন্থের তথ্য বিবৃতিতে কিংবা চিন্তা বিশ্লেষণে এই জাতীয় মানসিকতার পরিচয় আছে। কিন্তু ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২), কেলভিন (১৮২৪-১৯০৭), হাক্সলী (১৮২৫-১৮৯৫) প্রভৃতি বরেণ্য চিন্তা-নায়কদের বিচিত্র বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাচেতনার প্রভাব তিনি স্বকীয় অনুবর্তনে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিশ্বরহস্যোদ্ভবকারী একটা অন্বেষা প্রকৃতির মধ্যেই অন্তর্নিহিত হতে চেয়েছে। কিন্তু জড়জগতের অস্তিত্বে সংশয় তাঁর মনের অন্তস্তলে একটি সূক্ষ্ম দ্বিধার সুর জাগিয়ে রেখেছে।

জড় জগতের অস্তিত্বকে কল্পনারূপে জীবনরক্ষার একটা কৌশল হিসেবেই তিনি গ্রহণ করেছেন কেন না—'প্রকৃতি করাইতেছেন, তাই যথানিযুক্তবৎ করিতেছি।' জড়জগতের অস্তিত্বে সংশয় প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দরকে কিছু পরিমাণে বিচলিত করেছে। ইহ জীবনেরই পট-ভূমিতে—জগতের অন্তরস্থ একটা 'সুস্থ-বলিষ্ঠ ও সামর্থ্যবান' নিয়মের প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশ্বাস করেছেন। বিজ্ঞানভাবনাকে কিছু পরিমাণে শ্লথ করে দিয়ে পরাগত (Metaphysical) চেতনার প্রবাহে চিন্তা-শক্তিকে তিনি চালিত করলেন। 'প্রকৃতি'তে রামেন্দ্রপ্রতিভার সন্ধিলগ্ন। পরবর্তী 'জিজ্ঞাসায়' অধিকতর আত্মবিশ্বাস ও অসংশয়িত চেতনার প্রাবল্যে রামেন্দ্রসুন্দর এক নবজগৎ নির্মাণ করলেন। দর্শনকেই তিনি সমস্ত চিন্তা-চেতনার ভিত্তিভূমি রূপে গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে তাঁর সৃজনীসত্তা উল্লসিত হল না। বিজ্ঞানেরই চিন্তাতটে একটা অতিরিক্ত অনির্বাচ্য জিজ্ঞাসা তাঁকে প্রতিনিয়ত অতৃপ্ত করে রাখল। দর্শন বা বিজ্ঞান কোন পক্ষেই তিনি তাঁর জিজ্ঞাসার

পরিপূর্ণ উত্তর পেলেন না। জগৎরহস্তের সেই জিজ্ঞাসা সূত্রকে সমন্বিত করেছে বলেই গ্রন্থখানির নাম—'জিজ্ঞাসা।'

জিজ্ঞাসায় রামেন্দ্রসুন্দরে দর্শন-বিজ্ঞানমিশ্র বহুতর চিন্তার প্রতিফলন আছে। সমস্তাগুলির মৌলিক অবতারণা ও বিশ্লেষণের মধ্যেও তিনি নবতর পন্থার প্রবর্তনা করেছেন। নৈতিক মূল্যবোধের তত্ত্বগত ভাব বা বিজ্ঞান নির্ভর জড়জাগতিক ব্যাখ্যা তাঁকে এক্ষেত্রে তৃপ্ত করতে পারেনি এবং তাঁর বক্তব্যকে তিনি গ্রন্থখানির 'উৎসর্গ' অংশে ব্যক্ত করেছেন:

> "পিপাসামাত্র সম্বল দিয়া জীবনে প্রেরণ করিয়াছিলে, এই জিজ্ঞাসা সেই পিপাসার মূর্তিভেদ।"

রামেন্দ্রসুন্দরের মনের এই পটভূমিতে 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলিকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে:

(১) বিজ্ঞানভিত্তিক (২) দর্শন-বিজ্ঞান মিশ্র (৩) দার্শনিক প্রত্যয় ও প্রতীতিমূলক।

৩

'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের বিজ্ঞান অবয়বী প্রবন্ধগুলিতে প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর স্বক্ষেত্র ধরে অগ্রসর হয়েছেন। আত্যন্তিক বিজ্ঞাননিষ্ঠায় এ রচনাগুলিতে তাঁর কৌতূহল-জাগর মন বিশিষ্টরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে। আর নিজের বিপ্লবাত্মক চিন্তার এই প্রকাশমূলে সদাজাগ্রত একটি জিজ্ঞাসা বর্তমান রয়ে গেছে।

এই ধারায় প্রথমেই আমাদের আলোচ্য—"মাধ্যাকর্ষণ" নামীয় প্রবন্ধটি। নিউটনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের পরেই পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হল। মানবমন স্বভাবতঃই এর প্রকৃত কারণ জানতে চায়। কিন্তু এবিষয়ে লেখকের সরস মন্তব্যটি কি? তিনি বললেন:

> "নিউটন ও ভাস্করের বহু পূর্বে এই আকর্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। জম্বুক আঙ্গুরের প্রত্যাশায় ঊর্ধ্বমুখে অপেক্ষা করিয়াছিল। সেও জানিত যে আঙুর ফল পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট

হয়। অপিচ, আমার এই উক্তিতে নিউটনের ও ভাস্করের মহিমান্বিত যশোরাশির কণিকামাত্র অপচয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।”

এই আকর্ষণ জগৎবিধানের কেন্দ্রীয় সত্য এবং ‘শুধু আপেলফল কেন, গগনবিহারী শশধর স্বয়ং এই আকর্ষণ রজ্জুতে বাধা রহিয়া পৃথিবীকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না, ইহাও নিউটনের অতি পূর্ব হইতে মানবজাতি দেখিয়া আসিতেছে।’

এই জাতীয় সরস মন্তব্যের পরেই লেখক ‘নীরসপদার্থবিজ্ঞানতত্ত্বের’ই আশ্রয় নিয়েছেন। পৃথিবীর চারদিকে অবিরাম গতিতে ঘূর্ণ্যমান জ্যোতিষ্কগুলির অস্তিত্ব মানবমনে বহুকাল থেকেই বিদিত। কিন্তু এর মূলে লেখকের বিস্ময়কর সরস জিজ্ঞাসা—‘একটা উদ্দেশ্য না থাকিলে বিধাতা কি এতোই কাণ্ডজ্ঞানহীন যে, এতগুলি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ডকে অনর্থক ঘুরিয়া মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?’

গ্রহগুলির পৃথিবীর চারদিকে চক্রাকারে পরিভ্রমণকে বৈজ্ঞানিক কোপর্নিকস ‘দৃষ্টির ভ্রম রূপে’ ব্যাখ্যা করলেন। দৃষ্টিদোষেই গতি-নিয়মের জটিলতা সৃষ্টি হয় বলে তিনি মন্তব্য করলেন। শেষপর্যন্ত কোপর্নিকসের থিওরী অনুযায়ী স্থির হল সূর্য প্রদক্ষিণ করে বটে, এবং ‘উহাদের চলিবার পথ প্রায় বৃত্তাকার বটে, কিন্তু ঠিক বৃত্তাকার নহে।’ জ্যামিতিবিদ্যায় এরই নাম ‘অপবৃত্ত’; কেপ্‌লার গ্রহণের গতির নিয়মে এই ‘বৃত্তাভাস’ পথের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। বিভিন্ন গ্রহ বিভিন্ন পথে থেকেও আপন দূরত্বের হিসেবে একটা নিয়ম স্থির করে সেই হিসেবেই যে চলছে—এবিষয়ে কেপ্‌লারের বক্তব্যও তিনি প্রবন্ধ মধ্যে ব্যক্ত করছেন। কেপ্‌লারের মতে এ ঘোরা একান্তই তাদের মর্জির উপর নির্ভরশীল। সূর্যমণ্ডলকে ঘিরে ও সৌরজগৎকে ব্যাপ্ত করে একটা অবিরাম প্রবাহিত ঝটিকার মুখে গ্রহগুলি নিয়ত ঘূর্ণনশীল—এজাতীয় মত প্রকাশ করেছেন দেকার্তে। গ্রহণের গতির নিয়মের আলোচনা করলেন নিউটন, রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন—কেপ্‌লারের আবিষ্কৃত সমুদয় নিয়মগুলি

নিউটনই একটি সংক্ষিপ্ত সূত্রে বিন্যস্ত করেছেন। সূত্রটিকে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও চেতনার পারম্পর্য দিয়ে চিন্তা করে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ঃ

> "সূত্রটি এই। প্রত্যেক গ্রহের প্রতি সূর্যের অভিমুখে একটা আকর্ষণবল রহিয়াছে। যে গ্রহের দূরত্ব অধিক, এই আকর্ষণ বলের পরিমাণ দূরত্বের বর্গানুসারে তত অল্প।"

আবার এই সূত্রেই বলেছেন—বলের বিদ্যমানতার কারণ গতির উৎপত্তি। লেখকের মতে নিউটনই আবিষ্কার করেছিলেন জড়জগতের সর্বত্র জড় দ্রব্যমাত্রেরই গতিতে এই নিয়ম থাকা সম্ভব। সৌরজগতের অন্তর্বর্তী পদার্থমাত্রই গতিবিশিষ্ট। কিন্তু এই নিয়মের অস্তিত্বের কারণ কী? এই জিজ্ঞাসাই জেগেছে রামেন্দ্রসুন্দরের মনে ঃ

> "পৃথিবী আপেল ফলকে আকর্ষণ করে, তাই আপেলফল গতিবিশিষ্ট হয়, সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে তাই পৃথিবী সূর্যমুখে গতিবিশিষ্ট হয়;—বলিলে চোখে ধূলা দেওয়া হয়। এই ধরণের উত্তর বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, ধর্মবিরুদ্ধ, ইহা প্রতারণা। অজ্ঞানকে জ্ঞানের সাজ দিলে যদি প্রতারণা হয়—ইহা সেইরূপ প্রতারণা!"

মূলকথা প্রাকৃতিক নিয়মকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করাই বিজ্ঞানের কাজ। কেননা এবিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের নিশ্চিত বক্তব্য হল এই যে, 'ইহাতে নির্বোধের চোখে ধাঁধাঁ লাগে, বুদ্ধিমানের পক্ষে মানসিক শ্রমের সংক্ষেপ সাধন ঘটে।'

বিজ্ঞাননির্ভর রচনার মধ্যে এর পরে 'বর্ণতত্ত্ব' প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। লেখকের বিজ্ঞানচিন্তা এ প্রবন্ধে শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে ঃ

"বর্ণমাত্রেই কেবল আমাদের একটা উপলব্ধির বা প্রতীতির প্রকার ভেদমাত্র…বর্ণ ও বিশেষ জ্ঞান, তাহারও আবার সহস্র প্রকার ভেদ আছে।"

জগৎ জুড়ে তাপের যে অপচয় ঘটছে, তারই বিষয়ে লেখক উল্লেখ করেছেন ঃ

"কিন্তু পৃথিবী সূর্য হইতে প্রতিদিন যে তাপ পায়, তাহার কতটুকু কাজে লাগে? কতকটা কাজে লাগে বটে; কেননা, সেই কতকটার জোরেই আমাদের অশ্বো ধাবতি, বায়ুর্বাতি, জলং পততি, গৌঃ শব্দায়তেঃ, এমনকি এই জীবধাত্রী ধরিত্রীর প্রায় সকল কার্যই তাহারই বলে নির্বাহিত হইতেছে; কিন্তু বাকী যে তাপটা কোন কাজেই লাগেনা, কেবল সূর্য হইতে পৃথিবীতে যায় ও পৃথিবী হইতে আকাশে ছড়াইয়া পড়ে, কাহারও কোন কাজে লাগে না, কেবল অপচয় ও অপব্যয়ে যায়, তাহার তুলনায় উহার পরিমাণ কত সামান্য!"

তাপের ধর্ম নিয়েও রামেন্দ্রসুন্দর এ প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। লেখকের বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান ও নিষ্ঠা অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে এ প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রকৃতির রাজ্যের নিয়মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর প্রখ্যাত প্রবন্ধ "নিয়মের রাজত্ব" রচনা করেছিলেন। পার্থিব দ্রব্য মাত্রেরই অনিবার্য ভৌম আকর্ষণকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন—একমাত্র 'হাইড্রোজেন পূর্ণ বোম্বাই নারিকেলই' এই প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গে অপরাধী হতে পারে। হাস্যরসপূর্ণ সরস মন্তব্যের শেষে তিনি 'ভাষা' সংশোধনের পর 'প্রাকৃতিক আইনের' একটি বিজ্ঞাননিষ্ঠ ধারারও ব্যাখ্যা করেছেন। পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনতে চায়–তরল ও বায়বীয় পদার্থমাত্রে তেমনই 'মগ্নদ্রব্যমাত্রকেই উপরে তুলিতে চায়।' এই দ্বিতীয়োক্ত কার্যটির নাম চাপ। যেখানে আকর্ষণ চাপ থেকে প্রবল, উৎক্ষিপ্ত বস্তু সেখানে ভূকেন্দ্রিক হবেই। আর যেখানে চাপ ও আকর্ষণ সমান—সেখানে 'ন যযৌ ন তস্থৌ। জগতের নিগূঢ় বিধান ও রহস্য কেন্দ্রাভিমুখী নিয়মেরই অনুবর্তী, এই নিয়ম উপলব্ধি করতে পারলেই বুদ্ধির সংকীর্ণ অচলায়তন ভেঙে যাবে। নিয়মের ব্যতিক্রম যেখানে—বিশ্বজগতের সেখানেই মহানিয়ম। লেখক শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন:

"এই নিয়ম দেখিয়া বিস্ময়ের কোন হেতু নাই। এই ঘটনাটাই

বরং আশ্চর্য।…জগৎ ঘটনার প্রয়োজনটা কি ছিল, উহা ঘটেই বা কেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। ইহার উত্তরে অজ্ঞানবাদী বলেন, জানি না ; ভক্তে বলেন, ইহা কোন অঘটন-ঘটন-পটুর লীলা ; বৈদান্তিক বলেন, আমিই সেই অঘটন ঘটনায় পটু—আমার ইহাতে আনন্দ।"

এরূপ পূর্ণ আনন্দ, যুক্তি ও বিজ্ঞানের 'সাহচর্যগত ও পরম্পরাগত সম্পর্ক' দিয়েই রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি রচিত। 'জিজ্ঞাসা'র অন্তর্গত এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিকে সরস রচনারীতি ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ স্বতন্ত্ররূপেই আস্বাদ্য করে তুলেছে।

৪

রামেন্দ্রসুন্দরের দর্শনবিজ্ঞানমিশ্র প্রবন্ধগুলি 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। বৈজ্ঞানিক তথ্যের সংগে প্রজ্ঞাগভীর দার্শনিক মনন তাঁর এ-জাতীয় প্রবন্ধগুলিতে গংগাযমুনা সংগমে মিলিত হয়েছে। আর জগৎ রহস্যের ব্যাখ্যা তারই মধ্য দিয়ে গভীররূপে ব্যক্ত হয়েছে। এগুলি গাণিতিক সিদ্ধান্তে ভারবহ নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত বিধানের অনুবর্তী একথা রামেন্দ্রসুন্দর এখানে স্বীকার করেছেন। কিন্তু আয়ত্তাতীত কোন সত্যের প্রতি তিনি আস্থাশীল নন—প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতাকে তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। সেখানে তিনি মুক্তকণ্ঠ :

"আমার আত্মবিকাশের সহিত আমার পরিধি বাড়িতেছে। দেশের সীমারেখা ও কালের সীমারেখা দূর হইতে আরও দূরে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে।"

রামেন্দ্রসুন্দরের জ্ঞানের শক্তি এখানে আত্মিক বলে বলীয়ান। আমাদের সজীব ব্যষ্টি-সাধনা নিয়ে আমাদের স্বভাবের যে 'নন্দনীয়তা'—তারই স্বীকৃতিতে রামেন্দ্রসুন্দরের এ জাতীয় প্রবন্ধে অপরিসীম সার্থকতা এসেছে। এভাবেই প্রবন্ধগুলিতে জ্ঞানমার্গের সঙ্গে চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশের অনুভূতি সম্মিলিত হয়েছে। এই আত্মিক পিপাসা জীবনসম্পর্কীয় মুল্যমানকে একান্ত করে পেতে চায়,—দর্শন

এই তত্ত্বের জগৎকে ব্যাখ্যাত্মক করে তোলে। সেই সহজ জীবনদর্শন ও যুক্তিবাদী মানসিকতা 'জিজ্ঞাসা'র এ-জাতীয় প্রবন্ধগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র মানসিকতাকেই উপস্থাপিত করেছে।

'সৌন্দর্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে লেখকের আলোচ্য বিষয় হল সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ধারণা। কেবলমাত্র 'কবি নামধেয় মনুষ্যবিশেষই সৌন্দর্যমধুর অন্বেষণে ভ্রমরবৃত্তি হইয়া জীবনপাত' করেছে তাই নয়, এই সৌন্দর্য জগৎ থেকে অন্তর্হিত হলে 'কাব্যরস বর্জিত বিষয়ী লোকদিগের জন্যও দড়ি-কলসী সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া ওঠে।' কাজেই সাংসারিক নিত্য-নৈমিত্তিকতার সংগেও সৌন্দর্যের একটি আত্মিক সংযোগ আছে। লেখক এই প্রসংগেই সরস-গম্ভীর একটি বক্তব্যকে প্রতিপাদ্য করেছেন :

> "নীরব বনস্থলীতে জ্যোৎস্নাস্নাত শিলাতলে মহাশ্বেতার পার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া অতীতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে চন্দ্রকরাহত হইয়া মরিতে যাহার অভিলাষ না জন্মে, সে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য।"

অপর এক জায়গায় তিনি দার্শনিক প্রজ্ঞাসিদ্ধ মন্তব্য করেছেন :

> "সুন্দরের সহিত সুখের ও কুৎসিতের সংগে দুঃখের সম্বন্ধ। আবার সুখপ্রাপ্তির ও দুঃখ পরিহারের অধ্যবসায় ও ধারাবাহিক চেষ্টাকেই যদি জীবন বল, তাহা হইলে সৌন্দর্যপিপাসা জীবনের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়।"

সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের সৃষ্টি ও বিকাশই ললিতকলার অবলম্বিত বিষয়। মানবমনের 'ঈস্থেটিক বৃত্তি' নামধেয় অংশটি জীবিকার প্রশ্নের সংগে সম্বন্ধহীন। এ প্রবন্ধে লেখক একটি মৌলিক জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছেন—সৌন্দর্য কিসের ধর্ম? সুন্দরের যা সৌন্দর্য—তা সবসময় স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিগত ধর্ম নয়। সৌন্দর্যবোধচেতনা মৌলিক বুদ্ধি ও অনুভূতির তীক্ষ্মতার উপরে নির্ভর করে। সৌন্দর্যচেতনার একটি আপেক্ষিক মূল্যমান আছে। এই সৌন্দর্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ডারুইনের বিজ্ঞাননির্ভর আলোচনায় প্রত্যাবর্তন

করেছেন। জীবনের স্থূল প্রয়োজনের জন্যে সৌন্দর্যের যে অংশটুকু গ্রহণ করি—তারই ব্যাখ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন ঃ

> "অপিচ রঙদার পুষ্পবিশেষের নিকট গেলে মধুসঞ্চয়টাও ঘটিয়া থাকে, এই পর্যন্ত অভিজ্ঞতার জন্য প্রজাপতিকে বাহাদুরি দিতে পারি।"

রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় বক্তব্য সৌন্দর্যতত্ত্বের সংগেই যৌননির্বাচন তত্ত্ব সম্পৃক্ত! প্রকৃতির নিয়োগে সৌন্দর্যসৃষ্টির একটি উদাহরণও তিনি দিয়েছেন—পারাবত যখন বিস্ফারিত নীলকণ্ঠ আনম্র 'উন্নম্র করিয়া', 'কান্তাধ্বনিতের অনুকরণ করিয়া' পারাবতীর কাছে নৃত্যশীল হয়ে ওঠে, তখনই এ জাতীয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনুভূতির বৈচিত্র্য পরম্পরা নিয়ে সৌন্দর্যধারণায় 'চিত্তপ্রবাহ' বিষয়েরও তিনি উল্লেখ করেছেন। অনুভূতির মধ্যে বিচিত্রতা, বিশিষ্টতা ও নিত্য-পরিবর্তনশীলতা সৌন্দর্য্যের মধ্যে নবতর অনুভূতির বৈচিত্র্য এনে দেয়। সৌন্দর্যের আর একটি হেতু যে সহানুভূতি এবং ব্যাপকভাবে তা যে সমাজপুষ্টির অভিমুখেই অভিব্যক্ত, সে বিষয়েও তিনি অবলীলাকৃত মন্তব্য করেছেন এবং উদাহরণ হিসেবে বলেছেন—যেমন 'কবিতা কবির হৃদয় হইতে উথলিয়া জনসংঘের মুখে ছুটিয়া চলে'। এইভাবেই তিনি প্রথমত সৌন্দর্যের যে উপলব্ধিতে এসে পৌঁছেছেন, তা হল ঃ

> "যাহাতে চৈতন্যের প্রবাহকে স্থিরবেগে মন্দগতিতে চালিত রাখে তাহা সুন্দর। যাহাতে জীবনে ভরসা দেয়, প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তির সম্মুখে আত্মাকে ম্রিয়মান হইতে নিষেধ করে তাহা সুন্দর।"

এই জাতীয় সুন্দরের অর্থ হোল অনেকের মনে সমান প্রীতি জন্মিয়ে পরার্থপ্রবণ বৃত্তিগুলিকে সদাজাগরূক রাখা। কিন্তু এ জাতীয় সৌন্দর্যে ইহজাগতিক 'ইউটিলিটি'র সম্পর্ক আছে। সৌন্দর্যের মূল, প্রতিপাদ্য বিষয় কি? 'বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ' নির্মল উদ্দেশ্যহীন আনন্দের উৎপাদন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর পুনরায় ডারুইনের তত্ত্বকেই প্রতিপাদ্য করলেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যেই সৌন্দর্যবোধ জড়িত।

সৌন্দর্যের মধ্যে আনন্দের উপযোগিতাকে রামেন্দ্রসুন্দর স্বীকার করেছেন এবং আপাতনিয়মের বাহিরে অনির্দেশ্য অতিপ্রাকৃত সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি মহীয়সী সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এ প্রবন্ধের ফলশ্রুতিতে রামেন্দ্রসুন্দরের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ভাবনা-চিন্তা মানবিক নন্দনীয়তাকেই স্বীকার করেছে :

> "মানুষই সৌন্দর্য রচনা করে। সৌন্দর্য রচনাতেই মানুষের আনন্দ এবং এই আনন্দটুকুই তাহার লাভ। দুঃখবহুল সংসারে বিচরণকালে আনন্দরচনা না করিলে তাহার চলেনা। কাজেই সে বাধ্য হইয়া আনন্দধারনাশক্তি অর্থাৎ সৌন্দর্যবুদ্ধি ক্রমশঃ উপার্জন করিয়াছে।"

রামেন্দ্রসুন্দরের সৌন্দর্যসম্বন্ধীয় ধারণার সংগে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অনুরূপ বিষয়ক ধারণার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন :

> "বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কি বা ?
> মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রি দিবা।
> খাদ্যে খাদকে বাদ্যে বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য,
> ষড়-ঋতু-ছলে ষড়রিপু খেলে কাম হতে মাৎসর্য।"

(দুঃখবাদী, অনুপূর্বা)

জার্মান দার্শনিক থেকে টি, এস, এলিয়ট পর্যন্ত প্রকৃতিকে ও তার সৌন্দর্যসম্ভারকে এই দৃষ্টিতে দেখেছেন। জীবনের স্থূল প্রয়োজন ও যৌন-নির্বাচন তত্ত্বের সংগে সম্পৃক্ত করে রামেন্দ্রসুন্দরও সৌন্দর্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন। এ প্রবন্ধগুলি জটিল তত্ত্বসংক্রান্ত হলেও রামেন্দ্রসুন্দরের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মগত মনের রসসংবেদনায় সার্থক ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'সৃষ্টি' নামীয় প্রবন্ধে সৃষ্টি সম্বন্ধীয় প্রচলিত দার্শনিক মতবাদের সংগে তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তির অনুসরণ করেছেন। 'জগৎ আছে—স্রষ্টার ইচ্ছা' এ উক্তির মধ্যে কোন বিবাদ বিসংবাদ নেই। কিন্তু এ বিষয়ে লেখক বিজ্ঞানসম্মত বক্তব্য প্রকাশ করেছেন ;

"বিজ্ঞান যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে, যাহাকে তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বলিতেছ, তাহারই দ্বারা জগতের নির্মাণ প্রণালী ও ক্রিয়া প্রণালী সংগতভাবে বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে।...কিরূপে হইতেছে, তাহার উত্তর বিজ্ঞানের নিকট মিলিতে পারে।"

বিজ্ঞানের মতে 'ইথর' ও 'পরমাণু' এই দুইয়ের সমন্বয়ে জগৎস্ৃষ্ট। এ প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য, চেতনার বিকাশের সংগে সংগেই জগৎ ক্রমশঃ ব্যাপ্তির অভিব্যক্তি লাভ করছে। প্রকৃতি যেন আমারই অন্তরে, প্রকৃতির দেশব্যাপ্তি, কালব্যাপ্তি আমারই অন্তরের সামগ্রী। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে জগৎ অনন্ত এ-কথা অর্থহীন—কেননা, 'আমার জগৎ সান্ত। যেটুকু আমি যখন দেখিতেছি, সেইটুকুই তখন অস্তিত্ববান, তাহা ছাড়িয়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই।' প্রত্যেকের আপন আত্মবিকাশের সংগে জগতের পরিধি বাড়ছে—এই জাতীয় বিপ্লবাত্মক মতাদর্শই রামেন্দ্রসুন্দর প্রচার করেছেন।

'অমঙ্গলের উৎপত্তি' প্রবন্ধটিতে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, ঈশ্বরই আপন অভিপ্রায় অনুসারে 'মঙ্গল' ও 'অমঙ্গলের' সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঈশ্বর অমঙ্গলের সৃষ্টি করেছেন এ কথায় তাঁর পরম কারুণিকত্বের উপর সন্দেহ এসে পড়ে। কিন্তু মানুষের কল্পনা তর্কের খাতিরেই মঙ্গলময় দেবতার প্রতিযোগী আর এক অমঙ্গলময় দেবতার কল্পনা করেছে। কিন্তু লেখক অভিব্যক্তিবাদী দার্শনিকেরই মতানুসারী। 'অমঙ্গলের পরিণাম'কে তিনি 'মঙ্গল' রূপে চিহ্নিত করেছেন। এই পথকেই তিনি অভিব্যক্তির প্রধান পথরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। লেখক বলেছেন—যেমন দক্ষিণ ছাড়া বাম নেই, বাম ছাড়া দক্ষিণ নেই,—অমঙ্গলও মঙ্গলের সঙ্গে ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধে যুক্ত। এ ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর তাই মুক্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন :

"মঙ্গলকে আহ্বান কর, অমঙ্গলের নিকট প্রণত হও। একেকে আলিঙ্গন কর—অপরকে নমস্কার কর।"

জীবনের সঙ্গে মঙ্গল আর অমঙ্গল তাই নিবিড় সম্বন্ধে আত্মলীন হয়ে আছে।

'সত্য' নামক প্রবন্ধটিতে রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা সত্যের পরিধি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

"ভূয়োদর্শন ভূয়োদর্শনমাত্র, ভূয়ঃ শব্দের অর্থ ভূয়া, চির নহে। ভূয়োদর্শন বহুকাল ব্যাপিয়া দর্শন ও বহুদেশ ব্যাপিয়া দর্শন। উহা চিরকাল ব্যাপিয়া দর্শন বা সর্বদেশ ব্যাপিয়া দর্শন নহে। চিরের সহিত তুলনায়, সর্বের সহিত তুলনায়, ভূয়ঃ ও বহু নগণ্য মাত্র। উভয়ের তুলনা হয় না।"

রামেন্দ্রসুন্দরের এ জাতীয় উপলব্ধির মূলে সক্রিয় তাঁর 'বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি' ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা যে একটা চরম সত্য একথা এ প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করেছেন। আর ভূয়োদর্শন কেবল সংকীর্ণ দেশব্যাপক কালব্যাপক নিয়মের বিষয়েই জ্ঞান জন্মায়। জগতে অহংএর অস্তিত্ব অর্থাৎ অস্মিতাবোধ একটি বড় সত্য। এই পারমার্থিক সত্যকে গ্রহণ করেই যাবতীয় বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সত্যের কারবার। স্পেন্সারের স্বীকৃত সত্য অপেক্ষাও এই সত্যের তাৎপর্যকে ব্যাপকতর বলে রামেন্দ্রসুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন।

দার্শনিকের ভূমিকায় বিজ্ঞানসত্যকে বিশ্লেষণ করবার প্রজ্ঞাসুন্দর প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য 'মায়াপুরী' প্রবন্ধটির মধ্যেও রূপলাভ করেছে। মায়াপুরী এখানে বিশ্বজগৎ—এখানে আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ পরতন্ত্র বলে মনে করি। এই দেহ যা বিশ্বজগতের অপরাংশ—তাকে রামেন্দ্রসুন্দর 'বাহ্য জগৎ' রূপে চিহ্নিত করেছেন—এবং এখানে অনুক্ষণ যে কার্যাবলী সংঘটিত হচ্ছে নামান্তরে তাই হল জীবন।

বিশ্ব জগতের সংগে এই বাহ্যজগতের সম্পর্কটা কিরকম? সম্পর্কটা বিরোধের—বাহ্যজগৎ সব সময় তাকে আত্মসাৎ করতে চাইছে। আবার বাহ্যজগৎ এই বিশ্বজগৎ থেকে দৈহিক প্রয়োজনের সর্ববিধ সার সংগ্রহ করে আপনাকে লালিত ও বর্দ্ধিত করছে। এই দুই শক্তির উভয়তঃ যে দ্বন্দ্ব তাতে জীব একদিন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরাস্ত হয়। অবশ্য এই দ্বৈত শক্তির দ্বন্দ্বে আপনাকে পরিবর্তিত ও পরিণত করে নেবার বিশিষ্ট ক্ষমতা জীবদেহে বর্তমান। জীব মরণ

ধর্মশীল হলেও নবজীবনের অবিচ্ছিন্ন জীবন প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায় না। সন্তানোৎপাদনের মধ্য দিয়েই জাতির এই অবিচ্ছিন্ন ধারাপ্রবাহ রক্ষা পায়। প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিপাদ্য সত্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। জীবের দেহযন্ত্র মধ্যস্থ অবয়ব গুলির জীবনরক্ষার অনুকূল ক্ষমতা আছে। আত্মরক্ষা করতে হলে এই অনুকূল ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হবে। জীবন সংগ্রামে প্রতিকূল উপাদানকে বর্জন করতে হবে। চারদিক থেকে জাগতিক শক্তি সমূহ মানুষের ইন্দ্রিয়-দ্বারে এসে আঘাত করছে। মনুষ্যদেহ বাহ্যশক্তির সেই উত্তেজনায় সাড়া দেয়। জীবজগতের উচ্চতর প্রকোষ্ঠের বাসিন্দাদের এই বোধ আছে। উন্নত জীবের কাছে রূপরস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দের পরম্পরাই বাহ্যজগৎ। এই অনুভূতিতে যা হেয়, যা প্রতিকূল তা তাকে দুঃখ দেয়। এই রূপ রস ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান ও তৎসন্নিহিত সুখ দুঃখের চেতনা উচ্চতর জীবকে জীবনযুদ্ধে সমর্থ করে তুলেছে। এই শিক্ষা আমরা 'প্রকৃতি দেবীর পাঠশালায় লাভ করিয়াছি।' তিনি নিষ্ঠুর আইনের প্রয়োগে এই জাতীয় প্রবৃত্তিগুলিকে সুকঠোর ভাবে নিয়মবদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু অনেক সময় রূপরস-গন্ধাদির মিশ্রণ এমন ভাবে এসে তার ইন্দ্রিয়দ্বারে উপনীত হয় যে, সে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

এখানে সহজ সংস্কার কোন উপদেশ দেয় না—বুদ্ধি বৃদ্ধি ও বিচার শক্তিই যথার্থ গন্তব্যপথের নির্দেশনা দেয়। এই বুদ্ধি বৃত্তি নিঃসন্দেহে জীবনরক্ষার পক্ষে অনুকূল। এই বৃত্তিও প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্ব থেকে লব্ধ। এর পেছনে বৈজ্ঞানিকতাই সক্রিয়। দর্শনজাত অভিজ্ঞতাকে জীবনযুদ্ধের কাজে লাগানো বৈজ্ঞানিকের কাজ। এই বিশ্বজগৎ থেকে নানা উপায়ে আহৃত অভিজ্ঞতাকে তিলে তিলে সঞ্চয় করে আমরা যে তাকে কার্যে প্রয়োগ করে চলেছি—তার পেছনে আমাদের বিজ্ঞাননিষ্ঠ মানসিকতাই কার্যকর। এই মানসিকতা পুঞ্জীভূত হয়ে ও পুরুষানুক্রমে সজ্জিত-সঞ্চিত হয়ে মানবজাতির অভিজ্ঞতাকে বর্ধিত করে চলেছে। এই দিক দিয়েই আমরা প্রত্যেকে বিশ্বজগতের পর্য-

বেক্ষক। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শক্তিভেদে দৃষ্টিভেদ আছে। কেউ চক্ষুষ্মান —অপরে দৃষ্টিকে অন্ধের মতো ব্যবহার করে থাকে।

এ প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে—বৈজ্ঞানিক কিভাবে বিশ্বজগতের মূর্তি গড়ে নেন। সেখানে "শুধু আপন আপন কার্য সাধন করিয়া পরস্পরের সম্পর্ক আশ্রয়ে সেই অবয়বগুলির সুষ্ঠুভাবে যাহাতে সমুদয় যন্ত্রটিকে চালাইতে পারে, ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক সন্তুষ্ট থাকেন।" বৈজ্ঞানিক জড়জগৎকে স্বার্থসাধনে নিযুক্ত করে জীবনযুদ্ধে সাহায্য লাভ করছেন এবং জগতের নিয়মশৃঙ্খলা আবিষ্কার করে অজ্ঞানাধিকৃত প্রদেশকে আলোকিত করে পরম আনন্দ লাভ করছেন। প্রবন্ধের শেষে রামেন্দ্রসুন্দরের মননদীপ্ত পর্যালোচনা নিম্নরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে ঃ

> "বিজ্ঞানই আনন্দ ও বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। এই কল্পিত মায়াপুরীতে বদ্ধজীব যদি ব্যবহারিক সম্পর্কের জগতে থাকিয়াও পূর্ণ ভূমানন্দের পূর্বাস্বাদ লাভে অধিকারী হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উৎস হইতে যে আনন্দ প্রবাহ বিগলিত হইতেছে তাহাকে ব্যবহারিক জীবনের সুখ দুঃখের কর্দমলিপ্ত করিয়া পঙ্কিল করিও না।"

বিজ্ঞান বাদের নিরপেক্ষ সত্য বলে নির্দেশ করে প্রকৃতপক্ষে তারা মনঃকল্পিত সত্য মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান জড় বস্তুকে অবিনাশী আখ্যায় ভূষিত করেছিল। রামেন্দ্রসুন্দর এ মত স্বীকার করেননি অতিসংকীর্ণ পারিভাষিক অর্থে পরীক্ষালব্ধ সত্য থাকলেও রামেন্দ্রসুন্দর তার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধতা দেখতে পাননি। তাঁর মতে আমরা সংকীর্ণ ইন্দ্রিয় নিয়ে বিশ্বজগতের কিয়দংশ মাত্র প্রত্যক্ষ করছি। এ জাতীয় ভাবনা তিনি 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' প্রবন্ধটিতে ব্যক্ত করেছেন, বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ পরস্পর পরস্পরের উপযোগী করে গড়ে তুলেছে। কল্পিত বাহ্যজগতের ক্ষেত্রে পরীক্ষালব্ধ তথ্যের মধ্যে পরমার্থ সত্য কিছুই নিহিত নেই। এ সমস্তই ব্যবহার মাত্র। এ যেন দেবতাকে না পেয়ে তাঁর প্রতীকীরূপের বিগ্রহপূজা। তাই এ সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য ঃ

"বিজ্ঞান বিদ্যা যে মানুষের মনগড়া মূর্তিগুলির জন্য দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞানের কোন দোষ বা হীনতা নাই; কেন না, যাহাকে বিজ্ঞান বলে, তাহা মানুষেরই বিজ্ঞান; প্রকৃতি সংকীর্ণভাবে-জীবমাত্রার অনুকূল সংকীর্ণভাবে—মানুষকে গড়িয়াছেন বলিয়াই মানুষের বিজ্ঞানকেও তন্নির্মিত সংকীর্ণ দেবালয়ের মধ্যে সংকীর্ণ পৌত্তলিকতার আশ্রয় দিতে হইয়াছে।"১

বিজ্ঞানের আলোচিত বিশ্বজগতের সংগে আমাদের পরিদৃশ্যমান প্রত্যক্ষ জগতের পার্থক্য আছে। বিজ্ঞানবিদ্যার জগৎ প্রকৃতপক্ষে মানবসাধারণের জন্যে একটা কল্পিত জগৎ। এই কাল্পনিক জগতের যেখানে যেখানে আমরা সাদৃশ্য দেখতে পাই না—সেইখানেই আমরা অতিপ্রাকৃতের বিভীষিকা দেখতে পাই। এ বিষয়ে লেখকের আরও বিশিষ্ট মত এই যে, 'বিজ্ঞানবিদ্যার মতো ব্যবহারিক বিদ্যার সহিত পারমার্থিক বিদ্যার বা তত্ত্ববিদ্যার চিরন্তন বিরোধের মূল এখানে।' পরমার্থ বিদ্যার জগতে প্রাকৃত জগৎ ও অতিপ্রাকৃত জগৎ একান্তভাবেই ব্যক্তির আপনার—'মদ্রচিত এবং মৎকল্পিত'—বিশ্বজগতের দেবালয় জুড়ে পরমদেবতার অধিষ্ঠান করে। তবু দার্শনিকতার অন্বেষা খেয়ালের বশবর্তী হয়ে আমার উপর আর একজন কল্পনাকর্তার কল্পনা করিয়া কোথায় তিনি, কোথায় তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসার পণ্ডসারে আমি প্রবৃত্ত হই। ...বা স্বতন্ত্র আমার, স্বাধীন আমার, মুক্ত আমার, এইরূপ পরতন্ত্রবৎ পরাধীনবৎ বদ্ধবৎ আচরণেই,—এই পণ্ডশ্রম স্বীকারেই,— আমার আহ্লাদ এবং এই জিজ্ঞাসাতেই আমার আনন্দ।'

'অতিপ্রাকৃত' বিষয়ক যে দুটি প্রস্তাব 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—সেখানেও বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে তিনি প্রতিপাদ্য তত্ত্বের গভীরে অবতরণ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রকৃতিরাজ্যে কার্যকারণ শৃঙ্খলাহীন নিয়মের বৈপরীত্যকে স্বীকার করেননি। তিনি

---

১ বিজ্ঞানে পুতুলপূজা : জিজ্ঞাসা

সর্বত্রই 'প্রাকৃতকে' দেখেছেন। মানুষের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায় প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে কোন একপাক্ষিক মন্তব্য যুক্তিসহ নয়। কেননা সে নির্দে'শ অবৈজ্ঞানিক হতে বাধ্য।

বিজ্ঞান ও দর্শনের গুঢ় ও জটিল জিজ্ঞাসা তাঁর মনোলোকে যে ভাবাসঙ্গের সৃষ্টি করেছিল সেখানে শেষ উপলব্ধিটি কি? বিজ্ঞানের যেখানে সমাপ্তি—দর্শনের সেখানে সূত্রপাত। এই বিষয়েরই প্রতিপাদ্য প্রবন্ধ—'কে বড়? বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপকরণ খুঁজে পাওয়া সত্ত্বেও দার্শনিক মীমাংসাপথে রামেন্দ্র-মানস পথপরিক্রমা করেছে। বিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বের মধ্যদিয়ে প্রবন্ধটির সূত্রপাত—হলেও শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের কথাকে স্বীকার করেছেন। মানুষ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বা তৃণাদপি লঘু বিজ্ঞানবিদ্যার এই জাতীয় সিদ্ধান্তকে রামেন্দ্রসুন্দর স্বীকার করেননি। তবে ব্যাপারটা কি হয়? মানুষ কাল্পনিক অনাদির সৃষ্টি করে তারই নিরিখে আপনাকে ক্ষুদ্র বলে মনে করে। এই সূত্রেই আবেগবিহ্বল কণ্ঠেও তিনি তীক্ষ্ণ যুক্তির মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন:

> "জগৎ কোথায়? জগৎ তোমার বাহিরে নহে; জ্ঞাননেত্রে চাহিয়া দেখ, জগৎ তোমার অন্তরে। জীবসমাকুলা বসুন্ধরা, সূর্যকেন্দ্রক সৌরজগৎ, তারকাকীর্ণ নভস্তল তোমারই অন্তরে। তুমি বিশ্বজগতের অন্তর্গত নহ, বিশ্বজগৎই তোমার অন্তর্গত...তোমার জগৎ শান্ত, সংকীর্ণ, পরিধিবান।"

দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন—মানুষ তবে নিজ অভিব্যক্তির সহকারে আপন জগতের পরিধিকে বিস্তৃত করছে। নিজত্বের স্ফূর্তি এভাবেই অভিব্যক্ত হচ্ছে। মানুষ জগতে নিয়ম স্থাপনা করেছে বলেই জগতে নিয়ম আছে। কাজেই মানুষই জগতের বিধাতা। এমন একদিন ছিল-যেদিন মানুষ আপন কল্পনার সামনে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে স্থির করে নিয়েছিল, জীবনের কাল্পনিক দুঃখ থেকে নিষ্ফল প্রয়াসে মুক্তি পেতে চেয়েছে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর আশাবাদী দার্শনিক —মানুষের শক্তির পূর্ণত্বে তিনি বিশ্বাসী—পূর্ণ মনুষ্যত্বে বলীয়ান মনুষ্যের কণ্ঠে তিনি 'সোহহং' মহাবাক্য প্রতিধ্বনিত হবার প্রত্যাশী—

"কিন্তু সেই মহাবাক্য মনুষ্যকে অতীতকালের মতো স্বার্থপর বৈরাগ্যের পথে চালিত না করিয়া হৃদিস্থিত অন্তর্যামীর উপদিষ্ট কর্তব্যের পালনে নিযুক্ত রাখিয়া ব্যবহারিক মৃত্যুর ভয় হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া অভয় দান করিবে।"

৫

'জিজ্ঞাসায়' রামেন্দ্রসুন্দরের আর এক শ্রেণীর রচনা আছে—সেগুলি দার্শনিকতা মুখ্য এবং দার্শনিকের মেজাজ নিয়েই রচিত। রামেন্দ্রসুন্দরের এ জাতীয় প্রতিভার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করেছেন সমালোচক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে :

"জীবনে ধর্মনির্ভর দার্শনিকতার পরিবর্তে বিজ্ঞাননির্ভর দার্শনিকতার প্রতিষ্ঠা হইলে ইহার দৃষ্টিভংগী ও সামগ্রিক রূপের কিরূপ পরিবর্তন হয়, কোন্ নূতন জীবননীতি ও নিয়মনিষ্ঠা ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করে, নূতন ভাবকেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তিত হইবার ফলে ইহার কক্ষপথ কতটা নূতন বৃত্ত করে, এই সমস্ত নবাঙ্কুরিত, এখনও অনতিস্পষ্ট প্রশ্নজালই তাঁহার প্রবন্ধাবলীকে এক মননদীপ্ত ভাবপরিমণ্ডলে বেষ্টন করিয়াছে।১

'এক না দুই?' প্রবন্ধে তিনি পদার্থবিদ্যার মত উদ্ধার করে বললেন জড় ও শক্তি উভয়ই অবিনাশী নিত্য পদার্থ। এই দুই উপাদানই জাগতিক ক্রিয়ার মূল। কিন্তু জড়বাদ ও তদনুযায়ী গতিবাদ কিংবা শক্তিবাদকে রামেন্দ্রসুন্দর স্বীকার করেননি। তিনি এ ক্ষেত্রে দর্শনের আশ্রয় নিয়ে বলেছেন যে, অভাব থেকে ভাব কিংবা ভাব থেকে অভাব জন্মেনা। এই কথাটিকেই হার্বার্ট স্পেন্সর একটুখানি অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলেছিলেন—জড়ের ধ্বংস কিংবা শক্তির ধ্বংস অকল্পনীয়—অতএব তা ধ্বংসহীন। জড় যে শক্তির আশ্রয় তার প্রমাণ কি? পদার্থবিদ্যার মধ্যে জড়ের উল্লেখ সংজ্ঞামাত্র—স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণহীন। কিন্তু জড়বাদ অস্তিত্বহীন হলেও শক্তিবাদের ভিত্তি বেশ দৃঢ়তার সংগেই স্বীকৃত হতে পারে। আমাদের অনুভূতিতে শক্তির আনাগোনা মানে

১ বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা—পৃঃ ১৩৪

'কেবল কতকগুলি প্রতীতির উৎপত্তি ও বিলয়।' বাহ্যজগৎকে যদি কল্পনা বলা যায়—তবে রামেন্দ্রসুন্দরের মতে শক্তিবাদ বা জড়বাদ অমূলক হয়ে পড়বে। আত্মবাদ বা চেতনাবাদ স্থায়ী থাকবে। বাহ্য জগতের মুলে একটা কিছু আছে—যার স্বরূপ অজ্ঞেয়। অন্তর্জগতের মূলে যে অজ্ঞেয় স্বরূপ—তা হল চিৎ। কাজেই বাহ্যজগতের অস্তিত্ব আছে—এবং এখানে 'চিৎ ভোক্তা' জড় ভোগ্য।' সাংখ্যমতাবলম্বীদের কাছে এই উপলব্ধিই পুরুষ—প্রকৃতিরূপে আখ্যাত। 'এক আমির' দার্শনিক অস্তিত্বের উপকূলে রামেন্দ্রসুন্দর পৌঁছেছেন—কিন্তু সেই 'এক সহ।' শেষ পর্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দর এই সিদ্ধান্তে পেঁাছেছেন ঃ

"আমি সৎ—আমি 'আছি, আমি চিৎ—আমি চৈতন্যস্বরূপ আর—আর—নিতান্ত না ছাড়—আমি আনন্দ—আমি আনন্দস্বরূপ —আমি আছি, এই আমার আনন্দ।"

'জগতের অস্তিত্ব' 'আত্মার অবিনাশিতা' 'প্রতীত্যসমুৎপাদ', মুক্তি' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি রামেন্দ্রসুন্দরের বৈদান্তিক মনের সামীপ্য লাভ করেছে। প্রাচ্যপাশ্চাত্য দর্শনের গাম্ভীর্য ও পাণ্ডিত্যকে গ্রহণ করেছেন তিনি।

৬

প্রজ্ঞাসুন্দর রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভার এক অবিস্মরণীয় ফসল 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটি। এরই আলোকে তাঁর সমগ্র মনোজীবনকে অভ্রান্তরূপে আবিষ্কার করা যেতে পারে। রচনারীতি ও ভাষানুসরণের দিক দিয়ে তিনি সরলপন্থী। ১৩১১ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় 'বাংলাসাহিত্যের মাসিক বিবরণী'তে গ্রন্থখানি বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছিল ঃ

"রামেন্দ্রবাবুর পুস্তকখানিতে চিন্তাশীলতা বহুদিনের খোরাক সংগৃহীত আছে, উহাতে জ্ঞানকে উন্মেষিত, স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ সতর্কভাবে সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত রাখিবার উপযুক্ত বহুবিধ সম্ভার প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা দার্শনিকের মত সহজ—কিন্তু কবির মতো রসাল এবং

সমগ্র পুস্তকখানিতে সত্যানুসন্ধিৎসু শিক্ষামোদী প্রতিভার উজ্জ্বল্য প্রতিভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।"

রামেন্দ্রসুন্দরের সৌন্দর্যরসিক ও বিশ্লেষণ-নিপুণ মন 'জিজ্ঞাসা'য় অনবদ্য সৌন্দর্য ও ভাবরসকেই আস্বাদ্য করে তুলেছে। বিজ্ঞানমিশ্র ও দার্শনিকতত্ত্ব—বিশ্লেষিত 'জিজ্ঞাসা'র প্রবন্ধগুলি রামেন্দ্রসুন্দরের সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের পূর্ণোচ্ছলিত প্রকাশ। এখানে তিনি ব্যাপ্ত—বাংলাপ্রবন্ধের এ ক্ষেত্রে তিনি 'স্বরাজ্যে স্বরাট'।

'কর্মকথা'র রামেন্দ্রসুন্দর

১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত 'কর্মকথা' গ্রন্থটির 'নিবেদন' লিপিতে রামেন্দ্রসুন্দর একটি শপথ ব্যক্ত করেছিলেন :

> "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতংসমাঃ; এই বাক্যকে আমি ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধগুলি দাঁড় করাইয়াছি। কর্ম পরিত্যাগে মানুষের ক্ষমতাও নাই এবং অধিকারও নাই, ইহাই আমার মুখ্য বক্তব্য।"

সংগঠক রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাশীল মননই এ গ্রন্থে সমাজপন্থার অভ্রান্ত নির্দেশক। বেদপন্থী সমাজচিন্তার মূলে ধর্মের সংগে যে কর্মবাদের নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে এ গ্রন্থখানিতে রামেন্দ্রসুন্দর সেই পথেরই অনুসারী, —বুদ্ধি তাঁর নির্ণায়ক, চিন্তাশীলতার সংগে মননের যোগসাধন তাঁর লক্ষ্য এবং কর্মযোগীর ব্রতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনর্বিচারকে তিনি তাঁর অন্যতম দায়িত্বরূপে বিবেচনা করেছেন। এ গ্রন্থে চিন্তা-বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তিনি স্থিতধী। দর্শনের বিচার ও বিজ্ঞানের বিশ্লেষণকে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন বলেই এ গ্রন্থে তাঁর পক্ষে কর্মবাদের উদ্‌ঘোষণ সম্ভব হয়েছে :

> "আমার বিশ্বাস কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে যে বিরোধ দেখা যায় সেই বিরোধের মূলে সামঞ্জস্য আবিষ্কার ভগবানীতায় ঘটিয়াছে। Legality ও morality এই উভয়বিধ বিরুদ্ধ ধর্মের মূলগত ঐক্য-স্থাপনে ও সমন্বয় সাধনে গীতার মাহাত্ম্য।"

অবশ্য এক্ষেত্রে গীতাই তার একমাত্র অবলম্বনীয় নয়—আপন চিন্তার শক্তিতে তিনি কর্মময় জীবনের পূর্ণ ফলবন্ত আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। মূল শক্তিকে খুঁজেছেন বিজ্ঞানের উৎস থেকেই।

কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের এই নতুন কর্মনীতির স্বরূপ কি? সমাজচিন্তা ও ব্যক্তিত্ববোধ তাঁর চেতনায় এভাবে আন্দোলিত হল

কেন ? এর উত্তর সমসাময়িক যুগ ও সমাজ জীবনের বৈপ্লবিক ভাব ভাবনাকে রামেন্দ্রসুন্দর কি পরিমাণে আত্মস্থ করে নিতে পেরেছিলেন—তারই বিচারের উপর নির্ভরশীল। কোন দেশে কোন কালেই লেখক স্বয়ম্ভূরূপে আবির্ভূত হন না। ব্যক্তিমানবরূপে দেশ ও জাতি সম্পর্কে তাঁরও কিছু চিন্তা-চেতনা আছে। সেই দায়িত্বেরই পরিপূর্ণ প্রতিফলন কর্মকথায়' (১৯১৪)। কালটা কিছুটা আত্মজিজ্ঞাসার ও আত্ম-সংহতির। রবীন্দ্রমানস য়ুরোপীয় সমাজতত্ত্ব নিয়ে চিন্তামুখর। দেশের হৃদয়ের মধ্যে একটা দ্বিমুখী শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। একটি পাশ্চাত্য আধুনিক চিন্তাধারা—অপরটি সমসাময়িক ভারতবর্ষের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগ। সমাজে ও মনে যে শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে—'সর্বমানবিক অনুভূতিলোককে আয়ত্তাধীন করবার একটা নিয়ত আকর্ষণ লক্ষিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মন পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থাকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেছে :

> য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দে'খব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব—তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।

আমাদের দেশেও তখন মানুষ একটা নির্দিষ্ট খাতে অন্তরের আবেগকে প্রবাহিত করে দিতে চাইছে। বুদ্ধির আলোকে এই জাতীয় আত্ম-সমীক্ষাকে চিন্তান্বিত বিপ্লবরূপে প্রচার করল 'সবুজপত্র।' প্রমথ চৌধুরীর অধিনায়কত্বে 'সবুজপত্র' আনলো 'রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও অভিব্যক্তি।' আর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সেই অভিব্যক্তির শক্তিময় ব্যাখ্যা করলেন প্রথম চৌধুরী :

> "ইয়োরোপের প্রবল ঝাঁকুনীতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তার সাহায্যে আমরা সাহিত্যে ফুল কিংবা জীবনে ফল পাবো না।

এই নতুন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে প্রথমে লোকের মনে, তা প্রতিবিম্বিত করা দরকার।"১

এমনি পটভূমিতে 'কর্মকথার' সৃষ্টিলগ্ন। তাই সমালোচক কর্মকথার সৃষ্টিলগ্নকে 'একটা যুগের জ্ঞান ও যুক্তি-সাধনার বাণী বহন করেছে" বলে নির্দেশ করেছেন। সে যুগ ব্যাপক কর্মযজ্ঞের যুগ। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই একদা কর্ম সীমাবদ্ধ ছিল—কিন্তু এখন নানা দিক বিস্তারী কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে ধর্ম সংকীর্ণ সীমাবন্ধনকে অতিক্রম করেছে।

২

রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে কর্মের উপলব্ধি এসেছিল এক অকুণ্ঠ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। কি সেই বিশ্বাস? বস্তুজগতের অলংঘ্য নীতিনিয়মের প্রতি বিশ্বাস। মানুষের অনুভূতির তীব্রতম ও মুখ্যতম বিষয়ই হচ্ছে দুঃখ। মানুষকে 'পদে পদে জীবনের প্রসারণ বিরোধী' সর্বগ্রাসী জড়শক্তির ও সমাজশক্তির সংগে আত্মঘাতী সংগ্রাম করতে হয়। সংগ্রামে শিথিল-প্রযত্ন হলেই আত্মরক্ষায় সে কোন ক্রমেই যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। এই প্রসংগে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টির সংগে দার্শনিকতত্ত্বকে সমন্বিত করে তিনি অভিব্যক্তিবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন:

"অভিব্যক্তির আর একটা নাম ক্রমোন্নতি। অভিব্যক্তির ফলে সুখের উন্নতি ও দুঃখের হ্রাস। কিন্তু মৃত্যুর ন্যায় মহাদুঃখজনক ব্যাপার যখন প্রত্যেক মনুষ্যের ও সমস্ত মানবকূলের সম্মুখে প্রতিমূহূর্তে উপস্থিত রহিয়াছে ও সেই মৃত্যুর সহিত অবিরাম যুদ্ধই জীবের জীবন, এবং সেই মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টাতেই জীবের ক্রমোন্নতি বা অভিব্যক্তি, অথচ সেই মৃত্যুর হাত এড়াইবার কোন উপায় এ পর্যন্ত কোন জীব আবিষ্কার করিতে পারিল না; অভিব্যক্তির যখন এই পরিণাম, তখন ঐরূপে দুঃখের অপলাপ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল।"

১ 'সবুজপত্রের' মুখপত্র

জাগতিক সুখদুঃখ 'জ্ঞান' নামধারী ভ্রান্তি থেকে উৎপন্ন—উভয়ে একই 'বিক্রিয়ার এ-পিঠ ও-পিঠ।' দুঃখের পরিবর্তে দুঃখকে দূর করে তার স্থলে সুখপ্রতিষ্ঠার আশা মূঢ়তামাত্র। সুখদুঃখবিনির্মুক্ত অবস্থার মধ্যেই পরম পুরুষার্থ—অর্থাৎ সুখ থেকে মুক্তি—ভ্রান্তিপাশ থেকে মুক্তি—জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি। বৈরাগ্যের মধ্যে মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তিনিরোধক অনুশাসনই তিনি আবিষ্কার করেছেন। অথচ মনুষ্যজীবনে এই প্রবৃত্তি নিরোধক অনুশাসন এক ভয়াবহ ব্যাপার। এ প্রসংগে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ

> "সুবুদ্ধির মতো সমাজের মন যোগাইয়া আপনার স্বভাবলব্ধ প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিতে পারিলে সুশীল বলিয়া নাম পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু মানুষের মজ্জাগত চিরন্তন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি তাহার স্নায়ুতন্তুকে এরূপে উত্তেজিত ও তাহার মাংসপেশিগুলিকে এরূপে পরিচালিত করে যে, সমাজ মধ্যে সুশীলতার জন্য পুরস্কার লাভ করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

রাজতন্ত্র, লোকতন্ত্র, ধনতন্ত্র কোন তন্ত্রের উদ্যত ভ্রূকুটিই তাকে এক্ষেত্রে শাসনের অধীন করতে পারেনি। সমাজ মোটের উপর মানুষের কল্যাণের জন্যেই স্থাপিত। সমাজের হাতের ভীতিজনক দণ্ডে মানবীয় অপূর্ণতা আছে, কিন্তু সেই অমোঘ শাসনদণ্ড থেকে দূরবর্তী থাকার অধিকার মানুষের নেই। জীবন সংগ্রাম থেকে পলায়ন পাপ বলে গণ্য হবে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর একথাও বলেছেন যে, সমাজধর্ম স্বার্থমূলক। মনুষ্যসমাজের স্বার্থেই-এর প্রতিষ্ঠা। এ-স্থলে ধর্ম অর্থ কি? যা সমাজকে ধরে রাখে—যার উপর সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং যার বলে সমাজের স্থিতি ও গতি। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের একান্ত কামনা জড়ের বাঞ্ছনীয়—'সংসারের শোণিত কর্দমময় পিচ্ছিল ক্ষেত্রে সহস্রবার স্খলিতপদ' হয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েও জীবনযুদ্ধে নিযুক্ত থাকার মধ্যেই মানুষের গৌরব। এই মহনীয় শিক্ষার আলোকেই মানুষ কর্মানুষ্ঠান ও কর্তব্য পালনকে জীবনের শ্রেয়ো তপস্যারূপে গ্রহণ করবে।

সেখানেই প্রকৃত বৈরাগ্য, জড়তুল্য শান্তি সেখানে হীনপ্রভ। এখানেই প্রকৃত বৈরাগ্য।

'জীবন ও ধর্মের মধ্যে তিনি যে সম্পর্কের বিচার করেছেন—সেখানে তাঁর সমাজাভিমুখী মন উপলব্ধি করেছে—সমগ্র জগৎটারই আমার সংগে সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। এই কর্তব্যের সমষ্টিই হল ধর্ম। ধর্মের গতি সামঞ্জস্যের পূর্ণতার অভিমুখীন—সেখানে নেত্রী স্বয়ংপ্রকৃতি।

সমাজের প্রতি কর্তব্যপালনে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বিষয়েও এ গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর চিন্তা করেছেন, ধর্ম-অধর্ম বিষয়েও ভেবেছেন। স্বার্থের অভিমুখে, প্রবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা তার নাম অধর্ম। পরার্থের কিংবা নিবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা—তা অধর্ম। এ-ক্ষেত্রের সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

> স্বার্থ প্রবৃত্তিমাত্রকে প্রেম বলিয়া নির্দেশ করিলে, ধার্মিকের সংখ্যায় বিব্রত হইতে হয়। তবে দুই চারিটা ব্যতিক্রমের উদাহরণ হাতে রাখিয়া ধরিলে মোটামুটি অধিক ভুল না হইতে পারে। বিচারের কথা ছাড়িয়া নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি যে সকলের ভিন্ন ভিন্ন সমাজে অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার দিকে চাহিলেও সেই কথাই সমর্থিত হয়। প্রবৃত্তির নাম অধর্ম ও নিবৃত্তির নাম ধর্ম, এইরূপ ব্যাখ্যা বড় নূতন নহে।

পরার্থসাধন সমাজ-জীবনের জন্যে প্রয়োজন। নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও সমাজের কাছে মাথা নত করতে হবে। এইজাতীয় সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাই জীবন। মূলতঃ ধর্মাধর্মের প্রয়োগ অস্তিত্বের ক্ষেত্রেই হল সমাজ-জীবন। এ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট ঃ

> যেখনে সমাজ নাই, যেখানে ব্যক্তিগত জীবন সমষ্টীকৃত হইয়া সমাজজীবনে পরিণত হয় নাই, সেখানে ধর্মাধর্মের প্রয়োগ বা অস্তিত্ব নাই। যেখানে সমাজ বাঁধে নাই, সেখানে স্বতন্ত্রতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ; পরতন্ত্রতার লেশমাত্র নাই। সমাজের আঁটাআঁটির সহিত পরতন্ত্রতা আসে, পরের জন্য স্বার্থসংহার আসে, ধর্ম অভিব্যক্ত হয়।

সমাজের অবস্থাভেদে এই ধর্মাধর্মের অবস্থাভেদ ঘটে, ইহা এক প্রাকৃতিক নিয়ম, যা জীবরাজ্যের সর্বত্র বর্তমান—সমাজের পক্ষে এ তারই প্রয়োগ মাত্র।

মানুষ বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিচারপরায়ণ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষ সমাজ রক্ষণে বাধ্য। ব্যক্তির রক্ষার জন্য সমাজের প্রয়োজন। তথাপি ব্যক্তির স্বার্থই যে সবসময় সমাজের সার্বিক স্বার্থের অনুকূল হবে—একথা সবসময়ে হয়তো খাটে না। মানুষের জৈব প্রবৃত্তি তাকে সমাজের বাইরে বিকেন্দ্রিত করতে চায়—কিন্তু সমগ্র সামাজিক শক্তি তাকে আপন কেন্দ্রাভিমুখী করে রাখে। ব্যক্তিগত ভাবের সংগে সামাজিকত্বের দ্বন্দ্বে একটা সামঞ্জস্য মেনে তাকে চলতে হয়। মানুষের জীবত্বের তুলনায় তার সামাজিকত্বের অভিব্যক্তি অনেক পরিমাণে আধুনিক। সামাজিকত্বের সূত্রের সংগে জড়িত থেকে মানুষ কি পরিমাণে স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র থাকবে সে মীমাংসা আবশ্যকীয় হলেও তার সমাধানের উপারটি অনাবিষ্কৃত। এই সামাজিক দ্বন্দ্বে ব্যক্তির জয় কি সমাজের জয় হবে—প্রকৃতি সে ব্যাপারে নিরুত্তর। কিন্তু সমস্ত দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে রামেন্দ্রসুন্দরের মূল প্রতিপাদ্য কি? সামাজিকত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ বিকাশোন্মুখ অভিব্যক্তি। তিনি তাই স্পষ্টকণ্ঠ :

> মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ব্যক্তিরও অভিব্যক্তি আবশ্যক। সামাজিকত্বেরও অভিব্যক্তি আবশ্যক। ব্যক্তি সামাজিকত্বের সংগে চিরকাল দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত থাকুক। দ্বন্দ্বে ক্রমে উভয়েই স্ফূর্তি লাভ করুক, পুষ্টি লাভ করুক, অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হউক। প্রকৃতির ব্যবস্থা সর্বত্র এইরূপ।১

জীবের মধ্যে স্বার্থমূলক প্রবৃত্তিগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণের ভাবনায় মানুষকে জ্ঞানের উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করতে হবে। অর্থাৎ স্বার্থ-প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত তাকে হতেই হবে। ব্যক্তির অভিব্যক্তি যেমন জাতি রক্ষার জন্যে প্রয়োজন, সামাজিকত্বের বিকাশও সেইরূপে প্রয়োজন। যেহেতু মানুষ বুদ্ধিজীবি ও বিচারশীল—সেইজন্যে অতীতের স্মৃতিকে

অভিজ্ঞতার মধ্যে স্থাপন করে এবং ভবিষ্যতের পুরোদর্শনের পর্যালোচনা করে মানুষকে কর্তব্যের বিচার করতে হবে। রামেন্দ্র মানস সমাজের মধ্যে সাফল্য দেখতে পেয়েছেন কোন্‌খানে? যে সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সমবেত সমাজশক্তিরই করায়ত্ত। অপরপক্ষে, ব্যক্তিজীবন সমাজজীবনের প্রতিকূল হলে সে সমাজশক্তি পরাজিত হবে। ব্যক্তিগত নিবৃত্তি ও সংযমের বলে সমাজশক্তি দৃঢ় হলে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। রামেন্দ্রসুন্দর শেষ পর্যন্ত মানবিক প্রবৃত্তির পরার্থমুখী বিস্তারেই বিশ্বাসী এবং এক উজ্জ্বলতম আকাঙ্ক্ষিত দিনের প্রত্যাশী:

> "এমন দিন কি মনুষ্যের অদৃষ্টে আসিবে না, যখন জীবধর্ম ও মনুষ্যধর্ম পরস্পর সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইবে…পরার্থ স্বার্থে বিভেদ নাই। স্বার্থ পরার্থের অনুকূল, পরার্থ স্বার্থকে জাগ্রত করে। স্বার্থান্বেষণে সুখ, পরার্থান্বেষণে কেনই বা সুখ না হইবে?"[২]

সমাজ কতকগুলি বন্ধনের মধ্য দিয়ে আমাদের আদর্শকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে 'বিবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বন্ধনে আমাদিগকে সর্বদা আবদ্ধ' হয়ে থাকতে হবে। এই জাতীয় বন্ধনকে 'আচার' রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর এই জাতীয় আচারকে আন্তরিক ভাবের সূত্র দিয়ে মেনে নেননি। তাঁর মতে এই জাতীয় একান্ত আনুগত্য আমাদের 'স্বাধীনতার সংহার করে ও বন্ধনস্বরূপ হয়'; ইহা অকারণে সংসার যাতনা বাড়ায়। এ ক্ষেত্রে রামেন্দ্র-মানস বিদ্রোহী। তাঁর মতে:

> জরামরণের ন্যায় বিকট সত্য সম্মুখে থাকিতে, মিথ্যা বিভীষিকার সৃষ্টি করিতে, প্রকৃতি-বিহিত বিবিধ শৃঙ্খল বর্তমান থাকিতে অকারণে নূতন শিকল গড়াইতে মনুষ্য সকল সময়ে চাহে না।

---

১ কর্মকথা: ধর্মপ্রবৃত্তি

২ ঐ

কিন্তু মানবসমাজের অতিপ্রাচীন অবস্থায় যখন এই প্রথার উদ্ভাবন হয়েছিল তখন তা সম্পূর্ণ অর্থহীন ছিল না। তার একটা ঐতিহাসিক স্বাভাবিক মূল্য ছিল। মানবপ্রকৃতিতে স্থিতিপ্রবণতা অত্যন্ত প্রবল মাত্রায় বিদ্যমান। নবীন যতই লোভনীয় ও আকর্ষণীয় হোক না কেন—পরিচিত পুরাতনকে ত্যাগ করে নবীনবরণে সর্বদা মনুষ্যমন রাজী থাকে না। রামেন্দ্রসুন্দর মানুষের এই মৌল প্রকৃতির উপরেও আলোকপাত করেছেন ঃ

> মনুষ্যের প্রাচীন ইতিহাস মনুষ্যকে গঠিত করিয়া বর্ত্তমান পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মনুষ্য সেই ইতিহাসের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেয় মাত্র, স্বয়ং বলপ্রকাশপূর্বক স্রোতকে ঠেলিয়া অগ্রগামী হইতে সাহসী হয় না। তাহাকে দুর্বল বল, ক্ষতি নাই ; কেন না, তাহা সত্য কথা। কিন্তু তাহাকে দয়া করিও।

কিন্তু প্রথাকে অনুসরণ করে কৃত্রিম পদার্থকেও কি মানুষ কোন কাজে লাগাতে পারে না? আধুনিক সামাজিক প্রথার ও আচার অনুষ্ঠানের সে কালের পক্ষে সম্যক প্রয়োজনীয়তা বিষয়টি সমাজতত্ত্বের গবেষণার দ্বারা আবিষ্কৃত হতে পারে। জীবনের সৌন্দর্যবর্ধনের মধ্যেই লেখক তার প্রধান উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করেছেন।

লেখক রামেন্দ্রসুন্দর শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অনেক হানাহানি' সত্ত্বেও 'এই কৃত্রিমতাই' আমাদের মনুষ্যত্বের ভূষণ। তিনি বলেছেন ঃ

সমাজের সর্বত্রই কৃত্রিমতার এত বন্ধন। প্রতিবেশীর সহিত, নিতান্ত অন্তরঙ্গের সহিত, এমনকি, নিজের প্রতি ব্যবহারেও প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক কার্য সমাজকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুসারে সংযত করিয়া লইতে হয়। নতুবা শোভন হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আপন আপন রুচি ও ইচ্ছানুসারে আপন কর্তব্য স্থির করিতে চাহে, তাহাতে শৃঙ্খলা থাকেনা, শোভা থাকে না, সমস্তই বিপর্যস্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে,

তাহাতে সর্বসাধারণের সম্মতি আবশ্যক, ব্যক্তিগত স্বাধীন প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিলে চলে না। স্বাভাবিক মানবজীবনের শোভাবর্দ্ধনেই সামাজিকআচারের প্রধান উপযোগিতা। সমস্ত সামাজিক উপযোগিতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর সংস্কার ও প্রজ্ঞার সনাতন বিরোধকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—একেবারে কর্তব্য নির্দেশ করে, তাহার এদিক ওদিক থাকে না; তাহাতে ভ্রান্তি থাকে না; তাহাতে শিখিবার ও ঠেকিবার কিছুই থাকে না; তাহাতে উন্নতির অবনতির কোন আশা থাকে না।"

মানুষের এই প্রজ্ঞাই উন্নতিশীল—নিত্যবিশুদ্ধ হয়ে সে বিকশিত হচ্ছে। জীবনের মূলে ও জীবনের আরম্ভে যে বিরোধ সেই বিরোধের পরিচয় জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়া ও চেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই বিরোধের ফলেই সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি, অভিব্যক্তি ও পরিপুষ্টি। জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তির সংগে আবার ব্যক্তিগত জীবনের বৈচিত্র্যবিকাশ জড়িত। জীবন সংগ্রামে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে মানুষ দলবদ্ধভাবে থাকে। এই সমাজ-বদ্ধতা দিয়েই মানুষ জীবজগতের সার্বভৌম অধীশ্বর। জাতীয় জীবনের ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ সমাজস্থিত এবং সে জানে যে, সমাজে অবস্থিতিই তার পক্ষে জীবন সংগ্রামে আত্মরক্ষার উপায়। সমাজে অবস্থানের জন্যে মানুষকে আপনার স্বাতন্ত্র্য সংযত করে নিতে হয়।

প্রচলিত সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্যকেও রামেন্দ্রসুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজের মধ্যে কতিপয় নির্দিষ্ট লোক ধর্ম্মের প্রাণময়তাকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। ধর্মের প্রাণ কিসের মধ্যে গুহানিহিত? ধর্মের প্রাণ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমন্বয়ে। কিন্তু এই তত্ত্বের সাধক হয়ে ধর্মের সুনিপুণ পর্যালোচনার প্রয়োজন সমাজে নেই। প্রচলিত রীতিতে 'মালা-তিলক ও নামাবলীর' ব্যবহারে, কার্পণ্যহীন হতে পারলেই স্বীকৃতি পাওয়া যায়। ব্যক্তি বিশেষকে ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ে স্বাধীনতা দিতে সমাজ রাজী নয়। প্রসংগক্রমে ধর্মের ব্যাখ্যাও রামেন্দ্রসুন্দর করেছেন ঃ

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতভাষায় ধর্ম শব্দে মনুষ্যের কর্ত্তব্য সমষ্টিকে বুঝায়। মানুষের ইতিহাসে প্রাকৃতে ও অতি-প্রাকৃতের সহিত মানুষের কারবার লইয়া রিলিজন্ এবং মানুষের সহিত কারবার লইয়া মরালিটি। মানুষের ইতিহাসে প্রাকৃতে ও অতিপ্রাকৃতে বহুস্থলে মেশামেশি হইয়া গিয়া রিলিজন্ ও মরালিটির একটা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে।৩

ধর্মানুষ্ঠানই মনুষ্যসমাজকে একদা ধরে রেখেছিল। কিন্তু মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সমাজের খাতিরেই নিরোধ করতে হয়। যে সমাজে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়মিত—সে সমাজ তত সমর্থ এবং জীবনযুদ্ধে বলীয়ান। 'সামাজিক জীব সমাজের বেতনভোগী সৈনিক-মাত্র; সৈনিকের পক্ষে বশ্যতা ভিন্ন অন্যধর্ম নাই। "সামাজিক জীবের এই বশ্যতাকে রামেন্দ্রসুন্দর বিভিন্ন অর্থজ্ঞাপক নিহিতার্থের সংকেত দিয়েছেন :

> সামাজিক জীবের এই বশ্যতা স্থানভেদে ও পাত্রভেদে নানা নাম গ্রহণ করিয়াছে। কোথাও ইহা পিতৃভক্তি বা গুরুভক্তি কোথাও রাজভক্তি, স্বদেশভক্তি বা স্বজাতি ভক্তি নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই ভক্তি সর্বত্র মনুষ্য হৃদয় হইতে স্বয়ং উচ্ছ্বলিত না হইতে পারে, সেখানে ইহার স্বতঃ উচ্ছ্বাস ও স্বতঃবিকাশ নাই, সমাজ যেখানে বলপ্রয়োগে ও দণ্ডপ্রয়োগে আপন দাওয়া ষোলআনা বুঝিয়া লয়।

সমাজবন্ধনের ক্ষেত্রে রাজশাসন ও ধর্মশাসন কোন্‌টির অধিকতর প্রাবল্য? এ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের সুচিন্তিত অভিমত হল—'রাজশক্তি যেখানে রাজনৈতিক একতা সাধনে অসমর্থ, ধর্মশাসন সেখানে সমর্থ হয়। একে যাহা পারে না অন্যে তা অবলীলাক্রমে সম্পাদন করে।' সমাজের জীবনরক্ষার জন্যে রাজশাসন ও ধর্মশাসন দু'য়েরই উপযোগিতা তুল্যমূল্য।

মানুষকে যে কর্মানুষ্ঠান করতে হবে—তার মধ্যে তিনি জগদ্বিধানের

৩ কর্মকথা : ধর্মের অনুষ্ঠান

দুর্জ্ঞেয় নির্দ্দেশনায় বিশ্বাসী। লোকহিতের ব্যাপক সামাজিক চেতনায় রামেন্দ্রসুন্দর তাই দৃঢ়কণ্ঠ ঃ

> "আপনার দিকে চাহিও না; স্বার্থের দিকে চাহিও না, যাহাতে লোকহিত হয়, সেই দিকেই চল, লোকহিতেই ধর্ম, ইহার নাম হিতবাদ্।"

প্রসংগক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিতবাদ' বা 'ইউটিলিটি' তত্ত্ব স্মরণীয়। রামেন্দ্রসুন্দর ধর্মমাত্রকেই ত্যাগাত্মকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। যেদিন থেকে আর্যজাতির বেদপন্থী শাখা সমাজবদ্ধ হয়েছে—সেই দিন থেকে এই বিশিষ্ট ধর্ম আশ্রয় করে সেই সমাজ বিকশিত হয়েছে। ত্যাগাত্মক কর্ম দিয়ে জীবের সংগে জগতের প্রকৃত সামঞ্জস্য সাধনের কর্মই ধর্ম। ত্যাগাত্মক না হলে লোকহিত ধর্ম হয় না। বেদপন্থী সমাজের যজ্ঞ বিধির একটি প্রসারিত ব্যাখ্যা দান করেছেন তিনি। এক্ষেত্রে তিনি বিশ্বের সংগে ব্যক্তির সামঞ্জস্য সাধনের পটভূমিতে ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

> "যজ্ঞের মৌলিক তাৎপর্য ত্যাগ। এই কথাটি স্মরণ রাখিলেই বেদপন্থীর শাস্ত্রে যজ্ঞের মহিমা বুঝিতে পারা যাইবে। জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্য সাধন যজ্ঞ দ্বারাই সম্পন্ন হয়।"[৪]

সমাজ আর ব্যক্তির মধ্যে একটা পূর্ণসামঞ্জস্য স্থাপনের আদর্শই রামেন্দ্রসুন্দর কর্মকথায় ব্যক্ত করেছেন। সমাজ চিন্তায় রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন স্থিতিশীল সমাজ চিন্তার পরিপোষক। তাঁর সমাজবোধ সমাজতন্ত্রকে যতখানি স্বীকার করে নিয়েছে—গতিশীল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে তিনি ততখানি স্বীকার করেননি। রামেন্দ্রসুন্দরের 'কর্মকথা' একটা বিশিষ্ট যুগের ধারক। বিশ্বের মধ্যে তিনি একটা কর্মের শৃঙ্খলাকে আবিষ্কার করেছেন—ব্যক্তিচেতনাকে সেই সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।

'কর্মকথার' রামেন্দ্রসুন্দর সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ-নিপুণ ভাষ্যকার।

---

৪ যজ্ঞ ঃ কর্মকথা

'চরিত-কথা' কার রামেন্দ্রসুন্দর

আধুনিক সাহিত্যের আত্মোৎঘাটনের বহুতর মাধ্যমের মধ্যে জীবনী সাহিত্য একটি বিশেষ মহল। আনন্দের অনুশীলনে জীবনের বিবৃতির সংগে রচয়িতার নিবিড় ও উষ্ণ সান্নিধ্য এ-জাতীয় রচনায় একটি নিবিষ্ট অনুভব এনে দেয়। হৃদয়াবেগের গভীরতা ও স্বচ্ছ আন্তরিকতা নিবিড় আকৃষ্টিতে রসরূপ লাভ করে। এ জাতীয় সাহিত্য সময়ের দূরত্বের সংগে মনোজীবনের ঘটনা ঘনীভূত হয়ে দ্যোতনা-ঘনিম অন্তর্জীবনকেই আস্বাদ্য করে তোলে। অতএব দেখা গেল, সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটির মাধ্যমে প্রতিভার নিঃসংশয় বিশিষ্টতা বা সম্পন্নতা দেখাবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

ইতিহাসের সংগে জীবনচরিতের একটি আত্মিক যোগ আছে। কেননা ব্যক্তি জীবনের ইতিহাসই জীবনী—আর দেশ ও জাতির জীবনীই ইতিহাস। জীবনী লেখকের প্রতিশ্রুত দায়িত্ব তাই যথেষ্ট কষ্টবহ——কেননা, 'he always finds it difficult to isolate anything so fluid and mobile as the spirit of prsonality ;"[১] তাই জীবনীকারকে নিতান্ত বাহিরচারী তথ্যপঞ্জীকে অতিক্রম করে স্মৃতিবিধৃত মনোজীবনের রেখা ধরে একটি রসোদ্বোধিত প্রতীতির জাগরণ ঘটাতে হয়। তন্ময়তা ও মন্ময়তার কেন্দ্র কোরকে স্পর্শসন্মিলন ঘটিয়ে বর্ণে ও রেখায় পরিস্ফুট প্রত্যক্ষতা আনতে হয়। এ-ক্ষেত্রে তবে লক্ষ্যটা কি ? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশকে'ই ব্যক্ত করা। উদ্দেশ্য হল—'the truthful transmission of prsonality ;' যে সমস্ত ঘটনা জীবনের মূল তাৎপর্যের সংগে সন্নিহিত তাকেই অবলম্বন করতে হবে। কাজেই তথ্য সমাবেশ থেকে এ-ক্ষেত্রে ভাবসত্যই অধিকতর মূল্যবান। যাঁদের বলিষ্ঠ জীবনের ভাবসত্য মানুষের ইতিহাসকে বদ্‌লে দেয়—নানা

১ A Treasury of Intimate Biography : L. Snyder

মূল্যবোধ জাগ্রত করে—তাঁদের জীবনের সেই অভিজ্ঞতার একটা স্বয়ং-স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নেই—এ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একদা খেদ প্রকাশ করেছিলেন। নিজেই সেই অভাব দূরীকরণের জন্যে চিন্তান্বিত স্মরণীয় প্রয়াস রেখে গেছেন। আমাদের ইতিহাস যে কারণে নেই—সেই কারণে স্মরণীয় জীবন চরিতেরও এককালে সৃষ্টি হয়নি। চৈতন্যদেবের চরিতকাব্য ঐশ্বর্য ও ভাবের ভক্তিময় ব্যাখ্যায় রসার্দ্র। জীবনী সাহিত্যে তথ্যভিত্তিক যুক্তিবাদের অগ্রগতি দেখা গেল উনিশ শতকে। এই কাল এ-জাতীয় সৃষ্টি-সামর্থ্যের একটি আশ্চর্য সমৃদ্ধ যুগ। এর পশ্চাতে বাঙালী মানসে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব অবশ্যই স্মরণীয়। ১৮৮০ র পর থেকে কয়েকটি স্মরণীয় জীবনী-রচনার প্রয়াস দেখা যায়। এই সূত্রে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, মহেন্দ্রনাথরায়ের 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত', শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত', যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মধুসূদনের জীবনচরিত' ইত্যাদি স্মরণীয়। এ জীবন চরিতগুলি যে সে সময়ে 'মহামূল্য-রত্ন বিশেষ' হয়ে দাঁড়িয়েছিল—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সে-কথা স্বীকার করেছিলেন। [২]

২

জীবন-চরিতকে কেন্দ্র করে এই জাতীয় চরিত বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর উল্লেখযোগ্য প্রতিভার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। তাঁর এ-জাতীয় রচনাতেও তিনি উচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত—আপন বিশ্লেষণী শক্তির মৌলিকতায় মনীষীদের গঠন-মূলক চিন্তার ভিত্তিকেই বিশ্লেষণ করেছেন। সে ক্ষেত্রে দেশের ও জাতির সত্ত্বার প্রতি সচেতনতাই তাঁর চিন্তাধারাকে পরিচালনা করেছে। রামেন্দ্র সুন্দরের চিন্তামূলকতার মধ্যে এই ইহজাগতিক মঙ্গল-বোধই মৌলিক গ্রন্থি—যা তাঁকে 'চরিত-কথা' (১৯১৩) রচনায় প্রেরণা দান করেছে। এ-দিক দিয়ে মনীষী বিপিনচন্দ্র

২ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের ভাষণ

পাল তাঁর সহমর্মী। তিনি তীক্ষ্ণ যুক্তির দীপ্তিতে 'ইতিহাস এবং সমাজের পটভূমিতে ব্যক্তিকে স্থাপন করে তার 'আবির্ভাবকে' অর্থপূর্ণ-রূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর 'চরিতকথা' গ্রন্থে যে কয়েকজন মনীষীর চরিত্র-গত বিশেষত্বকে দার্শনিক ও সমাজভাবুকের দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা হলেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র. ইমান হেলম্‌হোলৎজ, অধ্যাপক মক্ষমূলর, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, রজনীকান্ত গুপ্ত, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তথ্যসমৃদ্ধ বিস্তৃত জীবনী এ-গুলি নয়। সংক্ষিপ্ত ও মিতায়তনের এই প্রবন্ধগুলি প্রশস্তিমূলক। কিন্তু দেশ ও জাতির উন্নয়নের পটভূমিকাতেই চরিত্রগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর-চরিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমেই সেই কর্মনিষ্ঠ বিরল ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি একটি বিনম্র প্রণাম রেখেছেন ঃ

> "বাক্‌যত কর্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্বস্ব সাধারণ বাঙালী, উভয়ের মধ্যে এতো ব্যবধান যে. স্ব-জাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্তন দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।"

বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি যে আদর্শের সন্ধান পেয়েছেন —সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে তিনি তার একান্তই অসদ্ভাব লক্ষ্য করেছেন। বিজ্ঞাননিষ্ঠ একটি উপমার আশ্রয় নিয়ে তিনি বলেছেন—প্রাণিতত্ত্ববিদেরা মেরুদণ্ডের সাবল্য অনুযায়ী প্রাণিসমষ্টিকে উন্নত ও অনুন্নত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন। বিদ্যাসাগরের মেরুদণ্ড লেখকের মতে 'সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশীল' শক্তির পরিচায়ক।

আমাদের সামাজিক জীবনে একদা সর্ববাদিসম্মত একটা সংকটাপন্ন মুমূর্ষু অবস্থা এসেছিল। আমাদের জাতীয় রুচির পরিবর্তন ও জাতীয় সাহিত্যের বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশের মধ্যে তখন নব জীবন সঞ্চারের প্রাণলক্ষণ গোচরীভূত হয়েছিল। রাষ্ট্রীক আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনের

সংগে সংগে দেশের মধ্যে স্বায়ত্ত শাসন লাভের একটা ঐকান্তিক প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের অভ্যুদয় সম্বন্ধে লেখক এক কথায় কোন আশাবাদী বিশ্বাসে বিশ্বাসী নন :

> "ধর্মের চারি পায়ের মধ্যে তিনটি একেবারে চিরদিনের মত খঞ্জ হইয়া গিয়াছে, অবশ্য এইরূপ বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য নই।"

এই প্রসংগেই আমাদের রাষ্ট্রিক অবস্থার প্রতিও তিনি আলোকপাত করেছেন। আমাদের সর্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী স্বভাবকে তিনি জাতীয় চরিত্রের কেন্দ্রীয় দৌর্বল্যরূপেই ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের সনাতন কোমলতা বৃত্তিই যে এ-জন্যে দায়ী সে বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর দৃঢ়-নিশ্চিত। জাতীয় চরিত্র সংশোধনের উপরেই যে জাতীয় উন্নতি নির্ভর-শীল এ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর একমত। কিন্তু এ উন্নতি ইচ্ছামাত্রসার। প্রসংগত তিনি একটি বৈজ্ঞানিক উপমা ব্যবহার করেছেন—

> "ডারুইনবাদীরা বলেন, কুম্ভীরেরও পূর্ব পুরুষ এককালে কেঁচোর মতো ছিল। কিন্তু সেই কুম্ভীরত্বে পরিণতির পূর্ব পর্যন্ত তাহাকে কত যুগ ব্যাপী জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে!"

বিদ্যাসাগর চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসংগে তিনি বলেছেন, বিদ্যাসাগর চরিত্রে পাশ্চাত্য জাতি সুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ অনেকে লক্ষ্য করে থাকেন। য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর অনেক বিষয়ে খাঁটিত্বের পরিচয়ে বিশ্বাসী। বিদ্যাসাগর চরিত্রে এই পৌরুষই অসাধারণ মাত্রায় বর্তমান ছিল। জীবনের প্রতিকূলতায় বাল্য থেকেই সংগ্রাম তাঁর চরিত্রের গঠনের মধ্যেই একটা প্রাণবন্ত শক্তিমান পৌরুষের সৃষ্টি করেছিল। এই শক্তির বলেই তিনি সমুদয় বিপত্তি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের সর্বশেষ পরিচয় তিনি বাঙালী—খাঁটি বাঙালী। পাশ্চাত্য স্পর্শের গ্রহণীয় টুকুমাত্র তিনি গ্রহণ করেছিলেন—কিন্তু প্রাণেমনে তিনি চিরন্তন খাঁটি বাঙালী। পাশ্চাত্য চরিত্রে দুর্লভ এমন প্রকৃতিগত পার্থক্যে পূর্ণ অনেক গুণও বিদ্যাসাগরের মধ্যে ছিল। প্রসংগক্রমে রামেন্দ্রসুন্দর 'মানবপ্রীতি' বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন :

"এই মানবপ্রীতি কোন সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে আবদ্ধ নহে, সমগ্র মানব সমাজ এই হিতৈষণার বিষয়ীভূত এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই হিতৈষণা ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং ইহার প্রভাবে যে কতো অলৌকিক ঘটনার, কতো অসাধারণ স্বার্থত্যাগের উদাহরণ মিলিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।"

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তরের পূর্ণোজ্জ্বলিত স্ফূর্তি মানবপ্রীতি ও বিশ্বহিতৈষণার আকৃতি পরিগ্রহ করে। সেখানে প্রাণের প্রবাহ যেন আপনার বেগ আপনি সহিতে না পারিয়া পরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পরের উপকার সেখানে প্রচ্ছন্ন নয়—নিজত্বের প্রচারমুখী একটি অভিব্যক্তিই সেখানে সোচ্চার। কিন্তু বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষণা সম্পূর্ণত প্রাচ্য ব্যাপার। স্বকার্যে তিনি উচ্চতর মানব-নীতিকেই জয়মাল্য দান করেছেন। দয়া প্রকাশকে সমাজতাত্ত্বিক নির্দেশে গহিত বলে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু গৌণভাবে ও পরোক্ষভাবে এ ব্যাপার যে সুফল উৎপাদন করে—সে বিষয়ে বিদ্যাসাগর চরিত্রের স্থিতধী বোধের ব্যাখ্যা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। প্রবৃত্তির তাড়নায় স্বার্থ ছেড়ে পরার্থের মুখেই সর্বপ্রকার মানবকর্মের গতির নির্দেশক বিদ্যাসাগর। সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরের বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের পরিচয়ও রামেন্দ্রসুন্দর দিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের 'বিদ্যাসাগর' রচনাটি বিষয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন :

"রামেন্দ্রসুন্দর লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের ভিতরে এই জাতীয় একটি সৃষ্টির উপাদান রহিয়াছে। এখানে শুধু বিদ্যাসাগরের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সন্নিবিষ্ট হয় নাই; সমস্ত সংবাদ ও তথ্যকে অবলম্বন করিয়া লেখক একটি সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিপুরুষকে তাঁহার মনের ভিতরে একটা বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন।"[৩]

---

৩ বাঙলা সাহিত্যের একদিক পৃঃ ১৩৩

৩

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি রামেন্দ্রমানসের পরিপুষ্টি ও বিশিষ্ট ধ্যান বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের যুগেই আপন নবতর প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিল। 'চরিত-কথা'র বঙ্কিমচন্দ্রের উপর প্রশস্তিমূলক প্রবন্ধের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর সেই প্রভাবের অনুবর্তী। বঙ্কিমচন্দ্র যে উচ্চশ্রেণীর কবি রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর উপন্যাস-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই সিদ্ধান্তে এসে পেঁৗছেছেন। মানুষের হৃদয়কে রামেন্দ্রসুন্দর 'জীবনব্যাপী মহাহবের কুরুক্ষেত্র' রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। এ বিষয়ে বিজ্ঞাননিষ্ঠ একটি বক্তব্য তাঁর প্রতিপাদ্য :

> মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে ; সেই দলের নাম সমাজ। দল বাধিয়া থাকিতে হইলে স্বাধীনতাকে ও স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হয় -নতুবা দল ভাঙিয়া যায়। যে পাশব প্রবৃত্তি সমাজকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে কেবল আত্মরক্ষার দিকে প্রেরিত করে, দলের কল্যাণার্থ সেই পাশব প্রবৃত্তির সংযমে বাধ্য হয়। সহজাত সংস্কারের অভাবে অতীতের অভিজ্ঞতায় ভর দিয়া, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, বুদ্ধিপূর্বক পাশব প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হয়। এইজন্য যে বুদ্ধি আবশ্যক, তাহার নাম ধর্মবুদ্ধি ; ইহা বিশিষ্টরূপে মানবধর্ম। ইহা সমাজ রক্ষার অনুকূল, ইহা লোকস্থিতির সহায়।

আমাদের জীবনের উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভুত্ব অনেক দিক থেকেই লক্ষণীয়। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে—'যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, সে জিনিস বাঙ্গলাদেশে অচল' এরূপ মন্তব্য অত্যুক্তি নয়। প্রসংগত তিনি গতিবিজ্ঞানের একটি শব্দের সাহায্য নিয়েছেন। শব্দটি হল 'মোমেণ্টস্'—বাংলায় অনুবাদ করলে যার অর্থ দাঁড়ায় 'ঝোঁক'। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়েকটা জিনিষকে ঝোঁক দিয়া ঠেলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই কয়টা জিনিস বাঙ্গলাদেশে চলিতেছে।

সেই জিনিসগুলা গতি উপার্জনের জন্য যেন বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণার অপেক্ষায় ছিল।' বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের যথার্থ দ্বিজত্ব প্রাপ্তির যুগ 'বঙ্গদর্শনের' যুগ। এ-কথা রামেন্দ্রসুন্দরও স্মরণ করেছেন :

> বঙ্গদর্শনই প্রথমে ভবিষ্যতের মাসিক পত্রের রচনারীতি ও সংকলনরীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিল; তদবধি সেই রীতি মাসিক পত্রের সম্পাদকগণ কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছে।

বিদেশের ভাষা অবলম্বন করে আমরা যে বড় হতে পারি না, বিদেশী ভাষামাত্রকেই অবলম্বন করে সাহিত্যসৃষ্টি করতে চাইলে তা' অস্বাভাবিকত্বে পরিণত হবে। বঙ্কিমের বহুপূর্বে মহাত্মা রামমোহন রায়ও স্বদেশের ভাষাকেই আশ্রয় করেছিলেন। বঙ্কিমের অবদান বিষয়ে চিন্তাশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্যের প্রবর্তক রামেন্দ্রসুন্দর :

> রামমোহন রায়ের ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ইঁহাদের দেহের জ্যোতির্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মাণিক্যও অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা যে কার্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল।

আমাদের মধ্যে একসময়ে পরধর্মের প্রতি একটা মোহ-ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল। ধর্মের একটা দিক আছে—যা দেশভেদে কালভেদে মূর্তির পার্থক্য গ্রহণ করে। কিন্তু ধর্ম যখন লোকস্থিতির সহায়, তখন ধর্মের এই অংশ দেশকালের অপেক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজের ইতিহাস ভিন্ন পথে চলেছে, তখন লোকস্থিতির অনুরোধে ধর্মকেও আত্মসমাজের অনুকূল মূর্তি গ্রহণ করতে হয়। আত্মধর্ম ও পরধর্মের ভেদ এখানেই এসে পড়ে। আমাদের শাস্ত্রে ধর্মশাস্ত্রের সংজ্ঞা খুব ব্যাপক। য়ুরোপীয় সমাজতন্ত্র ভারতের আধুনিক সমাজতন্ত্রের সংগে এক নয়—কাজেই য়ুরোপীয় ধর্ম আমাদের কাছে পরধর্ম। এইজাতীয় পরধর্ম বাৎসল্যের ঝোঁক যে আমাদের কেটেছিল—তার মূলে সক্রিয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মহৎ আহ্বান —স্বজাতিকে আপন ঘরে প্রত্যাবর্তনের জন্যে একটি কোমল ব্যাকুল

আহ্বান। এ-দিক দিয়ে তিনি তপস্বী। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতির অগ্রদূত ও বিপ্লবী চিন্তানায়ক। ধর্মের সার্বভৌমিক অংশের পর্যালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র মানবীয় বৃত্তিগুলির সর্ব্বায়ত সামঞ্জস্য বিধানকেই ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নৈয়ায়িক নিষ্ঠার আনুকূল্যে ধর্মের এই যে বিজ্ঞান-সিদ্ধ সংজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে একটা ব্যাপকতা আছে। এই ব্যাপকতার মধ্যে সার্বভৌমিক কিংবা প্রাদেশিক ধর্ম অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে পড়বে। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম স্বদেশের শাস্ত্র স্থাপন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসংগে রামেন্দ্রসুন্দরের শেষ বলিষ্ঠ বক্তব্য হল ঃ

> বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে আমাদিগের নিকট যুগধর্মের আবশ্যকতা নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং যুগধর্মের সংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তাঁহার মহৈশ্বর্যমণ্ডিত মূর্তি আমাদের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে বিজ্ঞাননিষ্ঠ নৈয়ায়িক নিষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব থেকেই আগত। রচনারীতির দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব রামেন্দ্রসুন্দরে কতোখানি আগত তা বিচার্য। রামেন্দ্রসুন্দরের জ্ঞাননিষ্ঠ মনীষায় বঙ্কিম প্রতিভার 'এনসাইক্লোপিডিক' দিকটি উদাহৃত—রচনা-রীতির মধ্যে সাহিত্যিক সৌরভও লক্ষ্য করা যায়।

৪

সনাতন ধর্মের ভিত্তিই যে প্রশস্ততর—সেই আশ্রয়ের পটভূমিতেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভার বিচার করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। সাহিত্যের মধ্যেই মানব-জীবনের স্ফূর্তি—মানব-জীবনের যাতে স্ফূর্তি ধর্মে তার অধিকার। ধর্মের অভিপ্রায় লোকস্থিতি, অতএব সাহিত্য ধর্মের সংগে অবিচ্ছিন্ন। এই অবিচ্ছিন্নতার সূত্রে লোকস্থিতির আনুকূল্যের জন্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের সেবকরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে প্রতিপন্ন করতে চাইলে তাঁকে সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ করা হয়ে যায়। কিন্তু

সমাজের ভাব-আন্দোলনের পুরোহিতরূপে তাঁর প্রভাব বাংলাসাহিত্যে একটি স্থায়ী চিহ্নরূপে বর্তমান থাকবে। আলোচনাক্রমে রামেন্দ্রসুন্দর ভারত সমাজের প্রধান লক্ষণ বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। সেই বিষয়টি হল 'স্বাতন্ত্র্যের সহকারে সংযম।' দেবেন্দ্রনাথ এ জাতীয় আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজের' মধ্যে এই কল্যাণী সংযমের পরিপূর্ণতাকে রামেন্দ্রসুন্দর শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার করে নিয়েছেন।

৫

বৈজ্ঞানিক অবদান প্রসংগে 'চরিত-কথা'য় রামেন্দ্রসুন্দর হেলম্‌-হোলৎজের চরিত-বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে ঃ

> হেলম্‌হোলৎজের পূর্বে শব্দবিজ্ঞান ও সংগীতবিজ্ঞান সম্বন্ধে গোটাকয়েক মোট কথা আবিষ্কৃত হইয়াছিল মাত্র। তিনিই সংগীতবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা।

দৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞানগ্রাহ্য অনেক রহস্যকে হেলম্‌হোলৎজ আবিষ্কার করেছিলেন। ইন্দ্রিয় আমাদের জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। বাহিরের গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদিময় তরঙ্গ কিভাবে আমাদের মস্তিষ্কে সংকেত প্রেরণ করে বাহিরের উপাদানকে ক্রমসজ্জায় সাজিয়ে নেয়—'জ্ঞান সাম্রাজ্যের তিন মহাদেশে একই সময়ে দিগ্বিজয়ে বাহির' হবার জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বব্যাখ্যা হেলম্‌হোলৎজেরই দান। জড়জগতের সংগে অন্তর্জগতের সম্বন্ধ নিরূপণ করে মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি সৌন্দর্যবোধের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ভাষা বিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রনায়ক অধ্যাপক মক্ষমূলরের প্রতিভা ও চরিত্র প্রসংগ নিয়েও রামেন্দ্রসুন্দর আলোচনা করেছেন। ঋগ্বেদ সংহিতাকে রামেন্দ্রসুন্দর আর্যজাতির প্রাচীনতম ও মানবজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থরূপে স্বীকার করেছেন। ভারতবর্ষে প্রবেশের প্রাক্-কালীন পুরাতন আর্য সমাজের অবস্থাও তিনি নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগকে রামেন্দ্রসুন্দর অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংগেই দেখেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন ঃ

তাঁহার আশঙ্কা ছিল, মনঃকল্পিত ভারতবর্ষের যে আদর্শ বহুদিন হইতে তাঁহার মনের মধ্যে বর্তমান ছিল, ভারতবর্ষ চোখের সম্মুখে আসিলে তাহা কোথায় ভাঙিয়া যাইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্মলগ্নে মক্ষমূলরের উপদেশ ও নির্দেশের সংগঠনমূলক দিকটির মাহাত্ম্যের কথাও রামেন্দ্রসুন্দর উল্লেখ করেছেন।

উমেশচন্দ্র বটব্যালের চরিত-কথা প্রসংগে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন—গার্হস্থ্য জীবনে বা রাজকীয় কর্মে তিনি বৃহৎ সমাজের সংগে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। স্বদেশের পুরাতন ইতিহাসের উদ্ধারেই উমেশচন্দ্র তাঁর প্রতিভাকে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি কর্মের প্রতি ও সত্যের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন করেছেন। পৌত্তলিকতার প্রতি আস্থা হারালেও শাস্ত্রবিরোধী আচারে তিনি কখনও প্রবৃত্ত হননি। অবশ্য সামাজিক ধর্ম সম্বন্ধে আধুনিক হিন্দুর কোন্ পন্থা অবলম্বনীয় উমেশচন্দ্রের ধারণার মধ্যে সেজাতীয় কোন স্পষ্টতা ছিলনা। যন্ত্রযোগে উপাসনার সমর্থন করেছিলেন তিনি। উমেশচন্দ্র সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের শেষ বক্তব্য ঃ

> যে ভাবপ্রবণ সমাজদ্রোহ ও কর্মদ্রোহ শাস্ত্রসম্মত নিষ্কাম কর্মতরতা হইতে আমাদের সমাজকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, উমেশচন্দ্র তৎপ্রতিকূলে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছিলেন।

প্রাবন্ধিক রজনীকান্ত গুপ্তের৪ সাহিত্য চেতনা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগে তাঁর আত্মিক সম্পর্কের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষারীতিরও প্রশংসা রামেন্দ্রসুন্দর করেছেন। তাঁর মধ্যে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি যে একটা শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব ছিল—সে বিষয়েরও স্পষ্ট উল্লেখ রামেন্দ্রসুন্দর করেছেন। বাংলা সাহিত্যের সেবাকেই রজনীকান্ত জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করে তারই মধ্যে আপনার সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করেছিলেন।

---

৪ প্রাবন্ধিক রজনীকান্ত গুপ্ত সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের মন্তব্য ও রজনীকান্তের সাহিত্যকৃতি বিষয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি ‘প্রাবন্ধিক ‘রজনীকান্ত গুপ্ত’ রচনাটিতে (অমৃত ঃ ২ নভেম্বর ১৯৬২)

'বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধে তিনি বলেন্দ্রনাথের কবিমানস ব্যাখ্যা করেছেন—সেই মর্মরহস্যের সূত্র সন্ধানের সংগে সংগে তাঁর গদ্যরীতিরও রূপসন্ধান করেছেন। বলেন্দ্রনাথের রচনার কেন্দ্রীয় শক্তিকে তিনি সামঞ্জস্য বোধ ও সংযমের মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন। বলেন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মর্মসত্যরূপে সৌন্দর্যচেতনাকেই ধ্যেয় করেছেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের দৃষ্টি মূলত একই দিকে। উভয় শাস্ত্রের মধ্যেই যখন সত্য ও সুন্দরকে শিবরূপে প্রতিপন্ন করা হয়—তখন বিজ্ঞান ও সাহিত্য তত্ত্ববিদ্যার এক পরম প্রকোষ্ঠে উপনীত হয়। একদেশদর্শিতা কিংবা দৃষ্টিবিভ্রম এই জাতীয় সামঞ্জস্য সাধনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। নির্মোহ সমালোচকের মত বা পথ বিজ্ঞাননিষ্ঠার সংগেই যে সম্পৃক্ত এ জাতীয় বোধ বলেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল—রামেন্দ্রসুন্দর এ বিষয়ে স্পষ্টকণ্ঠ। বলেন্দ্র-সমালোচনার একটি বিশিষ্ট মূল্যমানকে রামেন্দ্রসুন্দরই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সমসাময়িক যুগজীবনের বিশিষ্ট প্রয়োজনেই রামেন্দ্রসুন্দর 'চরিত-কথা'র প্রবন্ধগুলি রচনা করেছিলেন। কিন্তু সকল যুক্তি-তর্কের সংগে একটি বিশিষ্ট মননাদর্শ প্রবন্ধগুলিকে স্ব-মহিম করে রেখেছে। অন্তর্জীবনের বিশ্লেষণে, নতুন মূল্য নির্ণয়ে এ-প্রবন্ধগুলিতে রামেন্দ্র-সুন্দরের শ্রমনিষ্ঠ গবেষণার সংগে রসসৃষ্টির এক বাঞ্ছিত সমন্বয় ঘটেছে।

৬

স্বজাতির প্রতি আত্যন্তিক গর্ব অনুভব করতেন রামেন্দ্রসুন্দর। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েও পাশ্চাত্য সমাজধর্মকে তিনি সবসময়ে সমর্থন করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসংগে তিনি বলেছেন: 'বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রচারের পশ্চাতে যে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তিমান দেখি।'

'চরিত কথা'র প্রবন্ধগুলি প্রশস্তিমূলক এবং সংক্ষিপ্ত। এই

রচনাগুলি অতিরিক্ত তথ্যভারে দুর্বহ নয়। তুলনাক্রমে বিপিনচন্দ্রের চরিতকথার রচনাগুলি তথ্যবিকীর্ণ নয়, কিন্তু পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ রীতি রচনাগুলির মধ্যে আচ্ছন্ত আছে। পাশ্চাত্য ধর্মেতিহাসও সমাজ-বিজ্ঞানের সতর্ক বিচারণা করেছেন বিপিনচন্দ্র—কিন্তু তাঁর মনো-জীবনের বিশিষ্ট একটি দিক ভারতীয় ঐতিহ্যের লোকশ্রেয় তত্ত্বকেও শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার করে নিয়েছে। গুরুবাদ কিংবা অবতারবাদকে তিনি সমসায়িক যুগজীবনের নানা সমস্যার সংগে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। মহাপুরুষদের অন্তর্জীবন থেকে নানা সত্য উদ্ধার করে রামেন্দ্রসুন্দরও তার যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যুগ জীবনের নানা সমস্যাকে মহাপুরুষদের নির্দেশিত অভ্রান্ত জীবনসত্যের আনুকুল্যে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

'চরিতকথা'য় রামেন্দ্রসুন্দর আদর্শেরই ব্যাখ্যাতা—আর তার আকর্ষণ আপন অনুভূতির ঐতিহ্যগর্বী চেতনা থেকেই আগত।

বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ধারা ও রামেন্দ্রসুন্দর

বিজ্ঞানপ্রেমিক রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভার পরিচয়ে তাঁর 'প্রকৃতি' গ্রন্থখানির একটি স্বয়ংস্বতন্ত্র মূল্য আছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের মত ও পন্থানুসরণ করেও তিনি সে-ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন—তার পরিচয় আমরা তাঁর 'প্রকৃতি' গ্রন্থখানির আলোচনায় দেখাতে চেয়েছি। কিন্তু 'প্রকৃতি' ছাড়াও তাঁর 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০) ও 'জগৎ-কথা' (১৯২৬) গ্রন্থখানিও বিজ্ঞানচিন্তার দিক দিয়ে রামেন্দ্রমানসের প্রৌঢ় পরিণতির স্পর্শ লাভ করেছে। কিন্তু এই বিজ্ঞানচিন্তা তাঁর মনের সান্নিধ্যে এসে যে পরিণতি লাভ করল—এর পূর্বপটভূমিটি কি? প্রাচ্যপাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চিন্তার প্রভাব তাতে কতোখানি?

বিজ্ঞান-চেতনার ব্যুৎপত্তি গত অর্থের বিকাশ বিষয়ে ডক্টর সুকুমার সেন মূল্যবান মন্তব্য করেছেন—"বিজ্ঞান শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত ব্যাপক অর্থে ঊনবিংশ শতাব্দের ষষ্ঠ দশক অবধি চলে এসেছিল। এমন কি কবিতার বইয়ের নামেও 'বিজ্ঞান' অচল ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিশিষ্য রসিকচন্দ্র রায় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "বিজ্ঞানসাধুরঞ্জন" বার করেছিলেন।" বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত হল হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠার পর থেকে। প্রাক্-অক্ষয়কুমার দত্ত আমল পর্যন্ত বিজ্ঞান আলোচনার প্রয়াসে য়ুরোপীয় লেখকদেরই আত্যন্তিক প্রভাব। অক্ষয়কুমায় দত্ত থেকে বিজ্ঞানের চিন্তাসমৃদ্ধ যে যুগ সুরু হয়েছিল রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্য দিয়ে সে যুগের সমাপ্তি। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের তখন গঠনের যুগ। এ-ছাড়া বিশিস্ট বৈজ্ঞানিকেরাও বিজ্ঞান নিয়ে তাত্ত্বিক চিন্তা করেছেন।

পাশ্চাত্য 'science' শব্দটি নিয়ে আলোচনার ধারা প্লেটো থেকে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মনীষীর চিন্তায় নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়ে আসছে। বিজ্ঞানের মধ্যে নানারকম শ্রেণীবিভাজনও হয়েছে। ভারতে বিজ্ঞান চিন্তার প্রসারতা বিষয়ে একটি অভিপ্রায় ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের

একটি চার্টারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঘোষণা করেন। ভারতীয়দের এই জাতীয় শিক্ষার জন্যে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় অনুমোদিত হল। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্যে সরকারী অর্থানুকূল্যকে কার্যে প্রয়োগ বিষয়ে রামমোহন রায় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে একখানি চিঠিতে আপন মনের চিন্তাকে প্রকাশ করলেন :

> It will consequently promote more liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful sciences.

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রথম ঐতিহাসিক দলিল হল একখানি গণিতের বই—প্রণয়ন করেছিলেন রবার্ট মে। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক উইলিয়ম ইয়েট্স 'পদার্থবিদ্যাসার' ও 'জ্যোতির্বিদ্যা' নামে দু'খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছিল জন ক্লার্ক মার্শম্যান রচিত 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়।' 'বিদ্যাহারাবলী' উনিশ শতকের প্রথম দিকের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানিতে ফেলিক্স কেরীর বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বাঙলাভাষার প্রতি প্রীতির সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষায় প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চা আরম্ভ করেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বিজ্ঞানের তত্ত্বকে তিনি প্রাঞ্জল ও সাহিত্যগুণসম্পন্ন করে পরিবেশন করেন। তাঁর 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' জর্জ কুম্ব রচিত 'Constitution of Man' নামক গ্রন্থের ভাবানুবাদ। ১৮৫৬ সালে তাঁর 'পদার্থবিদ্যা' প্রকাশিত হয়। 'চারুপাঠ' নামীয় তাঁর পাঠ্যপুস্তকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বিজ্ঞানের তত্ত্বমাত্রকেই অবশ্য তিনি বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছেন—মৌলিকত্বের পরিচয় তাতে নেই। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামে যে কোষগ্রন্থখানি সম্পাদনা করেছিলেন তার মধ্যে 'ভূগোলবৃত্তান্ত' ও 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' নামীয় প্রবন্ধগ্রন্থ দু'খানি বিজ্ঞানবিষয়ক। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৬২ সালে 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' রচনা করেন। যেমন একটি অংশ :

দুই সরলরেখা ভিন্ন ভিন্ন দিকে আসিয়া সংস্পর্শ করিলে, তাহাদের পরস্পর অবনতিকে 'সরলরৈখিক কোণ' কহা যায়।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়েরই অনুসরণে এবং তাঁরই সম্মতি অনুযায়ী গ্রন্থখানি রচিত হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রণয়ন করেন। পদার্থ বিজ্ঞানের সংগে প্রথমভাগে সংশ্লিষ্ট গাণিতিক আলোচনাকেও তিনি পাদটীকায় স্থান দিয়েছেন। প্রধানত যন্ত্রবিজ্ঞান ও বাষ্পীয় যন্ত্র নিয়ে দ্বিতীয় ভাগে তিনি আলোচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিকে তিনি নিজস্ব চিন্তাচেতনার নিরিখে বিচার করেছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৫৪ সালে 'প্রাকৃত ভূগোল' প্রকাশ করলেন। তাঁর 'বিবিধার্থসংগ্রহ' পত্রিকায় তিনি প্রাণী-বিজ্ঞানের বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা করেন। পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক কতকগুনি উৎকৃষ্ট রচনাও এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম দু'বছরে যে কয়েকটি মুল্যবান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তার মূলে কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের। 'বঙ্গদর্শনের' পাতায় 'বিজ্ঞানকৌতুক' নামে একটি বিজ্ঞান-আলোচনার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্রই করে যান। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত স্তার উইলিয়ম টমসন কৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা', জৈবনিক' প্রভৃতি প্রবন্ধ পরে 'বিজ্ঞানরহস্যে' গ্রন্থভুক্ত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হত। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত এ ধারার প্রবন্ধগুলি হল ঃ

আশ্চর্য সৌরোৎপাত (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯); আকাশে কত তারা আছে? (অগ্রহায়ণ ১২৭৯), চঞ্চল জগৎ (ভাদ্র ১২৮০) গগন পর্যটন (পৌষ ১২৮০) প্রবন্ধগুলিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সংগে সংগে লৌকিক তথ্যের এক অপূর্ব রস সমন্বয় হয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞান কিংবা গণিত বিষয়ক প্রবন্ধেরও সন্ধান আমরা 'বঙ্গদর্শনের' পাতায় পাই। এ কৃতিত্ব বঙ্গিমচন্দ্রের বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনেরই প্রাপ্য।

রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে রচনা করেছিলেন—'বিশ্বপরিচয়'।

জ্যোতির্বিদ্যামূলক বিবরণ গ্রন্থখানির প্রাণমূল। পিতার কাছ থেকে গৃহীত বাল্যের বিজ্ঞান-পাঠের অফুরন্ত আকর্ষণে তাঁর মন গ্রহ-নক্ষত্রের বিবরণের পথপরিক্রমায় নিরুদ্দিষ্ট হত। 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুষ্পরিমেয় বৃহৎ ও তুরভিগম্য সূক্ষ্মের' বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থখানিতে।

বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র বসুর (১৮৫৮-১৯৩৭) প্রতিভার স্বাক্ষর বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিচিত্র কর্মসাধনা। কিন্তু বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাধনা বিষয়ে উল্লেখযোগ্যতার আলোচনা করতে গেলে তাঁকে অনিবার্যরূপে স্মরণ করতে হয়। তাঁর এ জাতীয় রচনাগুলিতে গভীর মনীষার সংগে তথ্য যেমনি সম্পৃক্ত—তেমনি তথ্যাভিচারী একটি সত্যের অভিজ্ঞানও গভীর ছায়া বিস্তার করে আছে। উচ্চতর বিজ্ঞান তার সমস্ত টেক্‌নিক্যাল বিদ্যাকে ছাড়িয়েও যে উচ্চ একটি দার্শনিক প্রতীতির মধ্যেই সার্থক—জগদীশচন্দ্র তাই প্রমাণ করেছেন। জগদীশচন্দ্রের ১ বাংলা রচনার পরিধি মিতায়তন। মুকুল, দাসী, প্রবাসী, সাহিত্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলি একটিমাত্র গ্রন্থ 'অব্যক্ত' (১৩২৮) তে সংকলিত হয়। অণু-পরমাণু থেকে বিশ্বজগতের সর্বত্র চরাচরব্যাপী যে অখণ্ড মহাশক্তির বিকাশ—জগদীশচন্দ্রের বিচিত্র জিজ্ঞাসায় তা ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর অখণ্ড অনাহত মন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কোন বিভেদ লক্ষ্য করেনি :

> কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক্ না···সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে—সেখানেই পূর্ণ সত্য।

বিশ্বব্যাপিনী চৈতন্যশক্তির লীলা অনুভব করার জন্যে মানুষকেও জগদীশচন্দ্র অনন্ত সম্ভাবনার পথনির্দেশ দিয়েছেন বলিষ্ঠ আশাবাদের স্বতোচ্চারে।

রামেন্দ্রসুন্দর এই ধারারই লেখক। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সমন্বয় তিনি করেছিলেন। তিনি 'দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা।'

২

'প্রকৃতি'তে রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানচেতনার যে সংকেত—'জগৎ-কথা'য় তা আরও সমৃদ্ধতর। দু'য়ের মধ্যে রচনাকালীন ব্যবধান প্রায় পঁচিশ বছর। এর মধ্যে বিজ্ঞানচিন্তায় রামেন্দ্রসুন্দরের মানসিকতার মধ্যেও পরিণতির পরিবর্তন এসেছে। এ বিষয়ে সমালোচক বলেছেন ঃ

> তাঁর প্রথম দিকের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দার্শনিক দৃষ্টিভংগীর তেমন কোন প্রভাব নেই। কিন্তু পঁচিশ বছর পরে বিজ্ঞানকে দেখেছেন স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে—সেখানে দর্শনের স্থান অনেকখানি।[২]

দর্শনের সংগে বিজ্ঞানের আত্মিক যোগ আছে। বিজ্ঞানচিন্তায় রামেন্দ্রসুন্দর দর্শন-চিন্তাসঞ্জাত ভাবধারার প্রভাব কোথা থেকে পেয়েছিলেন—'ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার-স্বাতন্ত্র্য' অধ্যায়ে আমরা সে বিষয়ের উল্লেখ করেছি। তা-ছাড়া দার্শনিক চিন্তাধারার সংগে বৈজ্ঞানিক চিন্তার মিশ্রণ প্রায় সকল যুগেই ঘটে থাকে। একজন ইংরেজ লেখকের এ বিষয়ক চিন্তার সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা যেতে পারে ঃ

> "The philosophy of any period is always largely interwoven with the science of the period."

রামেন্দ্রসুন্দরের 'জগৎ-কথা'র অধিকাংশ প্রবন্ধই 'জিজ্ঞাসা'র পরবর্তীকালের রচনা। রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টি এখানে জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের। এ বিষয়ে গ্রন্থখানির প্রস্তাবনা প্রবন্ধ 'জড়-জগতে' তিনি আলোকপাত করেছেন :

> জড় শব্দটি আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে গৃহীত। সেই প্রাচীন শাস্ত্রে যাহা চেতন নহে, তাহাকেই জড় বলিত। জগতে

---

১ জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা ঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত সাপ্তাহিক বসুমতী (২৮ নভেম্বর ১৯৬৩)

২ সাহিত্য বিচিত্রা ঃ ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়

> এমন একজন কেহ আছেন, তিনিই 'আমি'; আর যাহা কিছু আছে তিনিই অর্থাৎ সেই 'আমি'ই আমার জ্ঞাত।

মানুষের অন্তরেন্দ্রিয়ও তার জ্ঞানের বিষয়। পাশ্চাত্য শাস্ত্রে জগতের দু'টি অংশের কথা শোনা যায়—মন ও তথ্য বা matter; মনকে তত্ত্বরূপে গ্রহণ করে যে শাস্ত্র আলোচনা করে—তা হল মনোবিজ্ঞান আর যে শাস্ত্র পদার্থ বা matter নিয়ে আলোচনা করে, তা হল 'জড়বিজ্ঞান।' প্রাচীন শাস্ত্রকারদের হিসাব নিলে একালের মনোবিজ্ঞানেরও অধিকাংশ জড়বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।

এখানে তিনি সর্বাগ্রে 'প্রাকৃতিক নিয়মের' মূল্য স্বীকার করেছেন। বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রযুক্ত অর্থটি কি এবং পর্যবেক্ষণ করে জাগতিক ঘটনাগুলির পারস্পরিক অর্থ কি—সে বিষয়ে আমাদের জানতে হবে। কেননা এরূপ প্রকৃতির নিয়মের অস্তিত্ব সাবধানে 'অবেক্ষণ ও পরীক্ষণের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়।' এ-ক্ষেত্রে বিজ্ঞানে ও সহজ জ্ঞানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। রামেন্দ্রসুন্দর 'অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ', 'প্রাকৃতিক নিয়ম', 'বল', 'মাধ্যাকর্ষণ', 'বস্তুর পরিমাণ', 'মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম', 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া' প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রকৃতির বিচিত্র বিধানের জড়জাগতিক ব্যাখ্যা দান করেছেন। বিজ্ঞানবিদ্যার এই জ্ঞান সাবধানতার সংগেই যে বিচারলব্ধ একথা স্বীকার্য। এই স্বীকার্য সিদ্ধান্তে রামেন্দ্রসুন্দরও একমত। প্রাকৃতিক নিয়ম নতুন জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষগোচর করতে সহায়তা করে :

> কোন্ দিকে চলিলে নূতন তথ্যের সংবাদ জানিব, সেই পথ দেখায়।...বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার দ্বারা দীপশিখা জ্বালিয়া নূতন জ্ঞানলাভের পন্থা দেখাইয়া দেন। মানুষ তখন জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।

অবশ্য জগত্তত্ত্বের আলোচনায় বিজ্ঞানের ইতিহাসে চূড়ান্ত মীমাংসা বা ঐকমত্যে উপস্থিত হওয়া দুরূহ।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জড়জগৎ খুবই বিচিত্র—দুটি জিনিসের মধ্যে

এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঐক্য যেমন নেই—অনৈক্যও তেমনি নেই। যদি সম্পূর্ণও অনৈক্য থাকত, তবে তা থেকে সঞ্জাত জ্ঞান নিষ্ফল হত। বহুর মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠাতেই জীবনের অস্তিত্ব। বিজ্ঞান কি করে? অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার করে। মন ও বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে ইন্দ্রিয়গণ ক্রমশঃ বহুর মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার করে এবং সেই ঐক্যের গুণানুসারে বহুকে নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্রমের মধ্যে সাজিয়ে নেয়। এই ক্রম বা শ্রেণীবিভাগ কার্যই হল বিজ্ঞানের সৌধে আরোহণের উপায়।

'জগৎকথা'য় রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি হল বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্ব। মূল ও যৌগিক পদার্থ, জড়ের নিত্যতা, পরমাণু ও অণু, শক্তি ও তাপ, জড়ের গঠনপ্রণালী, আলোক, অদৃশ্য আলোক প্রভৃতি বিজ্ঞানবিষয়ক প্রাথমিক তত্ত্বাদি নিয়েই রামেন্দ্রসুন্দর আলোচনা করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানবিষয়ক অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বিচিত্র জগৎ' প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে—রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পরে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছিল। জড়জগৎ ও প্রাণের জগতের মধ্যে যে পার্থক্য তারই আলোকে রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিকের প্রতিপাদ্য জগতের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। প্রাকৃতিক ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়ের কোন উপায় বৈজ্ঞানিকের নেই। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষবাদী। তবে বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষবাদী হলেও 'কাহারও প্রত্যক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না।' বিজ্ঞানে যেগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে—সেগুলি মূলতঃ কাল্পনিক জগতের মধ্যেই ঘটে। 'বিজ্ঞান বিদ্যায় বাহ্যজগৎ' প্রবন্ধে বেইনের উক্তিকে কেন্দ্র করে রামেন্দ্রসুন্দর স্বকীয় যুক্তির তাৎপর্যকেই প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞানবিদ্যায় বাহ্য জগতের সন্ধান পরিক্রমায় রামেন্দ্রসুন্দর ব্যবহারিক জগৎ ও প্রত্যক্ষ বা প্রতিভাসিক জগতের সন্ধান পেয়েছেন। ব্যবহারিক জগৎ হল দৈনন্দিন প্রয়োজনের প্রত্যক্ষাত্মক জগৎ। ব্যবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ শৃঙ্খলাতত্ত্বের একটা ন্যায় আছে। প্রাতিভাসিক জগৎ কেবল প্রত্যক্ষ পরম্পরামাত্র—পরস্পরের মধ্যে

কোন বাধ্যবাধকতা নেই। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই এই প্রাতিভাসিক জগতের সৃষ্টি। ব্যবহারিক জগতে জীবনযাত্রার সুবিধার জন্যেই আমরা 'Uniformity of nature'কে মেনে চলি। বিজ্ঞান বিদ্যায় ব্যবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ-তত্ত্বের অন্যান্য সম্পর্ক আমরা মেনে চলি। প্রাতিভাসিক জগৎ ও ব্যবহারিক জগৎ এই উভয় জগতের মধ্যে পার্থক্যের কথা রামেন্দ্রসুন্দর অত্যন্ত স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য :

> এই প্রভেদটা ভাল করিয়া ধরা হয় না বলিয়াই বৈজ্ঞানিকে ও দার্শনিকে, দার্শনিকে ও দার্শনিকে, পণ্ডিতে পণ্ডিতে ঝগড়া মিটিতেছে না।

ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্যকের মতোই উক্তি করেছেন :

> ব্যবহারিক জগৎ যেন একখানা drama ;—উহার একটা plot আছে, একটা end আছে, গোড়ায় একটা design আছে ;—অঙ্কের পর অঙ্ক, একটা উদ্দেশ্য purpose লইয়া আসে—কেহই নিরর্থক আসে না।

আর প্রাতিভাসিক জগৎ যেন একটা epic poem—ঘটনাবহুল, বিচিত্র, উশৃঙ্খল ; সর্বত্রই একটা ওলট-পালট, বিপর্যয় ও বিপ্লবের কাণ্ড।

রামেন্দ্রসুন্দরের তৃতীয় জগৎ হল 'বাঙ্ময় জগৎ।' এখানে বাহ্য জগতের আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বিশিষ্ট মনোভংগী নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। অন্তরের প্রজ্ঞা দিয়ে আমরা নিজেদের মনের মধ্যে কতকগুলি Concept গড়ে নিই। এই প্রজ্ঞা হল বিচিত্র সৃষ্টিকর্ত্রী। বিশিষ্ট Concept তৈরীর মধ্য ।দয়ে আমাদের মনন কার্যের অতি সম্পন্ন রূপটিই প্রকাশ পায়। বৈজ্ঞানিক নিয়ত যে ব্যবহারিক জগতের সন্ধানতৎপর তা ইন্দ্রিয়ের স্পর্শের বাইরে। বৈজ্ঞানিক একটা মনগড়া জগতের সৃষ্টি করেন—এই জগৎ সংজ্ঞাসিদ্ধ বলেই 'বাঙ্ময় জগৎ'। এই অমূর্ত জগৎ নিয়েই বিজ্ঞানের জগৎ। বিজ্ঞানবিদ্যার একটি বিশিষ্ট ভিত্তিমূল নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে

আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে Conceptual জগৎ প্রকৃতপক্ষেই একটা নতুন জগৎ। এ জগৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অধিগম্য নয়। এই জাতীয় প্রতীতিগুলি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ বর্জিত, মানবীয় সুখ-দুঃখের আশা-আকাঙ্ক্ষার সংগে সম্পর্কহীন। কাজেই তা বৈজ্ঞানিকেরই সৃষ্ট এক নামময় জগৎ। বিজ্ঞান মনন কর্মের দ্বারা এই জগতের প্রত্যক্ষ-গোচর বিষয়গুলির পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

বিজ্ঞানবিদ্যা যথাসম্ভব ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরিক্ত বাহ্যজগতের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে। সকলের ইন্দ্রিয় শক্তি সমান নয় বলে বাহ্যজগতের বিশ্লেষণও স্থিতিস্থাপক হতে পারে না। শুধুমাত্র বিশ্লেষণ ও স্বরূপধর্ম নিয়ে বিজ্ঞানকে ক্ষান্ত থাকলে চলেনা। বিজ্ঞানবিদ্যাকে বাহ্যজগতের ও বাহ্যজগতের অন্তর্গত যাবতীয় বাহ্যদ্রব্যের একটা পরিচয় দিতে হয়।

বিজ্ঞানের আলোচ্য বাহ্যজগৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন—'বিজ্ঞানের আকাশ' প্রবন্ধে। বিজ্ঞানের আকাশ বলতে তিনি 'বাহ্য-জগৎ'কেই উদ্দেশ্য করেছেন। এই আকাশের রূপায়নের ক্ষেত্রে আমরা আপন আপন অনুভূতির আশ্রয় নিয়ে থাকি। অতএব এ আকাশ অনেকটাই মনগড়া—জ্ঞানের প্রতীতি ও সীমাবদ্ধ প্রত্যয় দিয়ে গড়ে তোলা এক উপলব্ধি। 'বৈজ্ঞানিকের আকাশ Cencept-ual'—কল্পনা তার ইচ্ছাধীন। বাহ্যতা যে মূর্তি নিয়ে আমাদের প্রত্যেকের কাছে উপস্থিত—সেটাই হল প্রত্যক্ষ আকাশ। রামেন্দ্রসুন্দর তাই বলেন ঃ

> বৈজ্ঞানিকের বাহ্যজগৎ, কাল্পনিক Conceptual বাহ্যজগৎ-বিজ্ঞানবিদ্যার আলোচ্য বাহ্যজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাকে সৃষ্টি না বলিয়া বিসৃষ্টি, বিসর্গ বা বিসর্জ্জন বলাই ভালো। জীবনের প্রত্যেক্ষ অনুভূতি, চেতন জীবের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে যেন বাহিরে বিসর্জন করা হইয়াছে।

জীবনযাত্রার প্রত্যেক বিরোধের অনুভূতিকে ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিকের বাহ্যজগৎ ও জড়জগতের সৃষ্টি। প্রত্যক্ষ বাহ্যজগতে বিরোধই

বস্তুরূপে কল্পিত হয়। বিরোধের মূল কারণ প্রাণময় জগতের অস্তিত্ব।

'প্রাণময় জগৎ' শীর্ষক রচনাটিতে প্রাণের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনাকালে প্রসংগক্রমে তিনি পরস্পরবিরোধী নানা মতবাদের উল্লেখ করেছেন। প্রাণীদেহে প্রোটোপ্লাজম্ বিষয় থেকে তিনি আলোচনা সুরু করেছেন। প্রাণবাদীদের মতানুযায়ী প্রাণের মধ্যে একটা স্বার্থ আছে। প্রাণধর্ম আপনাকে বহুগুণিত করে আপনাকে প্রসারিত করতে চায়—বিশ্বমধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায়। বিরোধের মধ্য দিয়ে সে আপনাকে বর্ধিত করতে চায়। বিরোধকে সে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করে আপন স্বার্থ অব্যাহত রাখতে চায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রাণের অদম্য শক্তিরই জয় ঘোষণা করেছেন ঃ

> প্রাণের প্রবাহ জড়তার বন্ধনে ধরা দিতে চাহিতেছে না। জড় অবিরাম নিয়মের বাঁধ বাঁধিয়া আপনার পাষাণতটের মধ্যে প্রাণের স্রোতকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু উচ্ছ্বসিত প্রাণের প্রবাহ বাঁধ ভাঙিয়া, কূল ছাপাইয়া, দুই কূল ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

এর পরে একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, বাহ্যজগৎ নয়—জীব মাত্রেই চঞ্চল। আপন চাঞ্চল্যকে জীবই বাহিরে শতধারে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে—ফলে জগৎ চঞ্চল হয়ে উঠছে। জগৎতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর প্রাণকে সবার আগে স্বীকার করে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি জড়বাদী বিজ্ঞানপন্থার অনুসারী নন। শেষ পর্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দর 'প্রজ্ঞা'র জয় ঘোষণা করেছেন। প্রাণের কাহিনী অর্থাৎ অবিরাম বিরোধের কাহিনী 'প্রজ্ঞা'র আলোকেই বিচার করা হয়েছে। জীবনযুদ্ধে এই প্রজ্ঞাই মানুষের কাছে ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। এই দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষই ছোটখাট বৈজ্ঞানিক। এ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য ঃ

> সে আপনার প্রজ্ঞার বলে আপনার জন্য একটা ক্বচিৎ ছিন্ন

ক্বচিৎ ভিন্ন নিয়মের সূত্র প্রস্তুত করিয়াছে, তাহাই ধরিয়া আপনার প্রাণযাত্রা নির্বাহ করিতেছে।

মানুষ এই প্রজ্ঞাজীবী এবং সেই কারণেই জীবনসংগ্রামে অপরাজেয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানচিন্তা এ-ভাবেই বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান-চিন্তার ধারায় অগ্রসর হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবাদ ও নৈয়ায়িক নিষ্ঠা তাঁকে এ-ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। পাশ্চাত্য প্রভাবও তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করেছে। কিন্তু সচেতন জাগ্রত মনের সমালোচনা ও আপন উপলব্ধির উপস্থাপনা মতাদর্শ-গুলিকে অনেকটাই স্বকীয়ত্বে মণ্ডিত করেছে। কেননা অপরের চেতনাকে তিনি 'চেতনা' আখ্যা দিতে রাজী নন—তাকে তিনি 'চেতনাভাস' রূপে চিহ্নিত করেছেন। জ্ঞানের উৎপত্তি কবে কিরূপে হয়েছে বিজ্ঞানবিদ্যা বা প্রাণীবিদ্যা তা বলতে অক্ষম। প্রসংগক্রমে তিনি সেখানে ডারুইন-পন্থীদের সমালোচনা করেছেন। ডারুইনের বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যাকে রামেন্দ্রসুন্দর যে জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন—এ কথা তথাপি অস্বীকার করা যায়না। সামাজিক বিবর্তনের এই প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্র ডারুইন থেকে স্পেন্সার ও কোঁতের ধ্রুববাদের অনুসারী। জ্ঞান সঞ্চারে প্রাণীর জীবনসংগ্রামে কোন লাভ আছে কি না ডারুইন-পন্থীরা শুধুমাত্র তাই দেখেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের স্বতোদ্ভাবিত চিন্তার ধারায় প্রাণীবিদ্যা জ্ঞানকে জীবন-যুদ্ধের একটি প্রয়োজনীয় অস্ত্রস্বরূপে মনে করে।

রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-চিন্তার এই সামগ্রিক পরিচায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, রামেন্দ্রমানসের বিজ্ঞান-চিন্তার মনোজীবনের সুস্পষ্ট কতকগুলি ধাপ আছে—বিবর্ত্তনের স্পষ্টতা আছে। রামেন্দ্রসুন্দরের এই বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তার অনুবর্তনের ক্ষেত্রে জগদীনন্দ রায়কে স্মরণ করতে পারি।

রামেন্দ্র-প্রতিভা : 'নানাকথা'

রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা বোধ হয়—তিনি শুধুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানচর্চার সাধক ছিলেন না—দেশ ও জাতিকে বৃহত্তর কল্যাণ-শক্তির মধ্যে উত্তীর্ণ করে দেওয়া ছিল তাঁর সচেতন লক্ষ্য। বেদান্তের বাণীকে আপনার সত্তার মধ্যে অন্তরীণ করতে পেরেছিলেন বলেই আধ্যাত্মিক অর্থে তিনি আত্মজ্ঞানের অনুসরণ করতে পেরেছিলেন। নিজের প্রতি বিশ্বাস, অনুকরণযোগ্য মনুষ্য ধর্মের আদর্শ সৃষ্টি এবং পরমাত্মসাধনে আত্মবোধকে উদ্দীপিত করা—এই স্বীকৃত সত্যাদর্শের দায়-দায়িত্ব রামেন্দ্র-চেতনায় কখনই উপেক্ষিত ছিল না। তাঁর 'এনসাইক্লোপিডীক' বা বিশ্ববিদ্যাতীর্থঙ্কর জ্ঞানকে তিনি গণতান্ত্রিক পরমাত্মসাধনের ক্ষেত্রে ও কাজে লাগিয়েছিলেন। রামেন্দ্র-মনীষা বিচারণার এ ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য সূত্র হল—তিনি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মননরীতির সেতুবন্ধন করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকে তাঁর উপলব্ধি 'জাগতিক ঘটনাপরম্পরার মধ্যে' সম্বন্ধযুক্ত ও শৃঙ্খলান্বিত ঘটনাবৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেছিল—কিন্তু বিংশ শতাব্দীর রামেন্দ্রসুন্দরের মননে প্রবল বিরোধের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেছে—নিয়মের প্রভুত্ব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নেই—বৈজ্ঞানিকের কল্পনায় মাত্র তার স্থিতি।

রামেন্দ্র-মানসের এই যে বিবর্তন—এ বুদ্ধিজগতের পরিবর্তনেরই দ্যোতক। অক্ষয়-বঙ্কিমযুগে আত্মকেন্দ্রিক সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবোধ গৌণ হল। সর্বজনের 'হিতবাদ' কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক একটা সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস দেখা দিল। এই প্রয়াসের মধ্যে এমন একটা মূল্যমান ছিল—যা একটি কেন্দ্রীয় বন্ধনকে সম্ভবপর করে তুলতে পারে। সমাজ সংগঠনের এই নীতি-রচনার সাধনায় আমাদের দেশের চিন্তানায়কদের পাশ্চাত্য মনীষীদের চিন্তা-সঞ্জাত জগতের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে হয়েছে—অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিজেদের সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রেও তাকে প্রয়োগক্ষম করে তুলতে হয়েছে।

কাজেই যুগের প্রয়োজনে পাশ্চাত্য চিন্তারীতির প্রভাব অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত সকল চিন্তানায়ককেই সাহিত্য-সমাজ কিংবা ধর্মের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষতাবাদ-হিতবাদ বা বিবর্তনবাদের প্রয়োগ ও তার বিচার বিশিষ্টতার দাবী রাখে। পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের আনুকূল্যের সংগে সংগে মনের জগতেরও সম্প্রসারণ ঘটেছে। আমাদের সমাজ সংগঠনার যে নীতি ছিল রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্রের আদর্শ তার প্রমাণ। ধর্মতত্ত্বের যে নবভিত্তি স্থাপনের কাজে তাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন—তার মধ্যে বঙ্কিম চন্দ্রের বিশ্বাশ্রয়ী মানুষের জন্যে সৃষ্ট ধর্মতত্ত্বের প্রভাব সেখানে ছিল। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রেখে বৈদান্তিক বিশ্বাসে সর্বমানবিক প্রীতির বিষয়ে উদ্ভিন্ন ভাবপ্রচারক হয়েছিলেন বিবেকানন্দ। প্রাচ্য পাশ্চাত্য এই প্রভাবে আমাদের চিন্তানায়কেরাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর ডারুইনের তত্ত্বদ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন —তেমনি স্পেন্সারের তত্ত্ব দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্পেন্সারের প্রভাবে জীবনে একটা ব্যাপক সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে এই দুই চিন্তাসূত্র একটা সংশয়বাদের সৃষ্টি করেছিল।

নব্য বিজ্ঞানবাদ ঐতিহ্যের আয়তনকে অস্বীকার করেছিল। আমাদের ব্যাপক মননশক্তিকে যেমন তা প্রভাবিত করেছে—দর্শনের ক্ষেত্রেও অনিবার্য প্রভাব এনেছে। নৈতিক জীবনের সংকট উনিশ শতকে তখন আবার প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই সময় বেদান্তের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রামেন্দ্রমনীষা যুগসন্ধিক্ষণের পাশ্চাত্য মননাদর্শকে আপন মনোভূমিতে চিন্তা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি চেতনাকে বিশ্বচেতনার প্রসারে পরিচালিত করতে চাইলেন—বিশ্বাসের পূর্ণমূল্য স্থাপিত হল বেদান্তে।

রামেন্দ্রসুন্দর সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে কর্মীপুরুষরূপে অবতীর্ণ হননি। বঙ্কিমচন্দ্র তার সমাজ চিন্তার মধ্যে সুচিন্তিত আদর্শবাদের প্রবর্তনা করেছিলেন। এ আদর্শবাদ একটা স্বয়ংস্বতন্ত্র দর্শনের পর্যায়ে

উন্নীত হয়েছিল বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। এ দিক দিয়ে বঙ্কিম চন্দ্রের সংগে রামেন্দ্রসুন্দরের পার্থক্য আছে। সমাজচিন্তার ব্যাখ্যাতা তিনি—সমাজ সম্পর্কে মৌলিক কোন চিন্তার প্রবর্ত্তক তিনি নন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মৌলিক ভাবাদর্শের চিন্তানায়ক—সর্বন্ধর প্রতিভার বৈপ্লবিক প্রচারক। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। যদিচ ফ্রান্সের ভাববাদী দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষজ্ঞানকে ইন্দ্রিয়বস্তুর সীমামাত্রে আবদ্ধ দেখেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য epitemologyর আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন—ভাববাদী দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত তিনি হননি। প্রগতিবাদী বিপ্লবী বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ-সমালোচনায় সাংশ্লেষিক দর্শন অনুসরণ করেছেন। 'সাম্যে' সমাজের সব শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন—কিন্তু তাদের মধ্যে ধনবণ্টনের সাম্য থাক এটাই বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। বস্তুবাদী বা জড়বাদী দৃষ্টিকে তিনি স্বীকার করেননি। অবশ্য 'অনুশীলনতত্ত্বের' প্রচারকালে তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিকতার পরিবর্তে হিন্দু ধর্মাচরণকেই তিনি আশ্রয় করতে চেয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের সমাজ ব্যাখ্যার মধ্যেও অভিনবত্ব আছে। শেষজীবনে দর্শনের পটভূমি তাঁকে আকর্ষণ করল। বুদ্ধি ও বিবেকের দ্বারা জ্ঞানের পিপাসাকেই তিনি মূলতঃ চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন। জাপানী পণ্ডিত ওকাকুরার কাছে তিনি বেদের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। দর্শনের দ্বারা বাস্তব-অতীত সত্ত্বাকে জেনে তিনি বৈজ্ঞানিক থেকে হলেন দার্শনিক। তাঁর সমাজচিন্তার মধ্যেও মনো-জীবনের এই মূল সংকেতের পরিচয় আছে। তাঁর বক্তব্যকে তিনি হয়তো বঙ্কিমের মতো শিল্প করে তুলতে পারেননি। শিল্পী হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু বস্তু বা তথ্যকে নিতে পেরেছিলেন।

২

মনোজীবন বা যুগজীবনের পূর্বপটভূমি স্মরণে রেখেই রামেন্দ্র-সুন্দরের সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ 'নানা কথা' (১৯২৪)র বিচার করতে হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তথ্য চিন্তা দিয়েই রামেন্দ্রসুন্দর এখানে তার নির্ধারিত বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন। দেশ ও জাতিকে তিনি

বৃহত্তর সত্তার মধ্যে উত্তীর্ণ করে দিতে চেয়েছেন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বচেতনা কিংবা কর্মক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয় তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সমাজানুগত্যকেই রামেন্দ্রসুন্দরের মন স্বীকার করে নিয়েছে। স্বধর্ম ও সমাজপ্রীতি ছিল তাঁর চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। রামেন্দ্রসুন্দরের সমাজচিন্তা ক্রমবিবর্তনের ধারাকে স্বীকার করেছে। ব্যষ্টি কিংবা সমাজের দ্বন্দ্ব নয়—সামঞ্জস্যসাধনকেই তিনি বড় বলে মনে করেছেন।

ইংরেজি শিক্ষার জন্যে একদা সারা দেশে প্রাচীন ও নবীনপন্থীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু নিত্যকারের প্রয়োজনকে এই শিক্ষাব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত তৃপ্ত করতে পারেনি ঃ

> প্রাচীনপন্থীরা বলিতেছেন, ইংরাজী শিখিয়া ছেলেগুলা কেবল সহবৎ বর্জিত হইতেছে, ধর্মজ্ঞানশূন্য হইতেছে, নাস্তিক হইতেছে।

রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্টতই বলেছেন ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় ধরার ভারস্বরূপ হয়ে পড়েছে। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনার সময় প্রাচ্য শিক্ষার বিরুদ্ধে যে যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছিল—ইংরেজি শিক্ষাপ্রণালীর ক্ষেত্রে এখন সেই যুক্তিই প্রযোজ্য। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি লোকের অনুরক্তি জন্মালো না বলে তিনি খেদ প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞান শিক্ষার সংগে সম্পর্কবিশিষ্ট টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার প্রবর্তন বিষয়েও তিনি 'সামাজিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার' প্রবন্ধে চিন্তা করেছেন। এককালে অবহেলিত প্রাচ্যশিক্ষাকে বর্তমানে সুদৃষ্টির সংগে দেখা হচ্ছে বলে লেখক মন্তব্য করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন ঃ

> আমাদের মত ফিলজফিক্যাল জাতি স্বভাবতঃই হাস্যরসের আস্বাদে বঞ্চিত ; কিন্তু বর্তমানকালে ইংরাজী বিদ্যা গলাধঃ-করণের সহকারে গীতা ও চাণক্য শ্লোকের চাটনির ব্যবস্থা হইয়া যে নিতান্ত আংগ্লোবেদিক খেচরান্ন ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে নিতান্ত অরসিকেরও রসপ্রবৃত্তি না হইয়া যায় না। যাঁহারা সনাতন ধর্মের বা জাতীয় আচারের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঈদৃশ কৌতুকের অভিনয় করিতেছেন, তাঁহাদের অভিনয়

> দেখিয়া রসগ্রাহী লোকের হাস্য সংবরণ কঠিন হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের আন্তরিক উদ্দেশ্যকে আমি শ্রদ্ধা করি।

জ্ঞানকে রামেন্দ্রসুন্দর চেষ্টার প্রসূতি বলেননি। ভাবকেই চেষ্টার প্রসূতি বলে নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন চেষ্টা থেকে উৎপন্ন কর্ম সমষ্টি নিয়েই মানুষের জীবন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত—সে সম্বন্ধেও রামেন্দ্র-সুন্দর নানাজনের নানা মত উদ্ধার করে নিজস্ব মত দিয়েছেন ঃ

> এক সম্প্রদায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য লিবারেল এজুকেশন দেওয়া। এই লিবারাল এজুকেশন শব্দটা খুব জমকালো শুনায়; দূর হইতে উহা সূর্যকরমণ্ডিত আকাশচারী একখণ্ড মেঘের মত খুব জাঁকাল মূর্তি গ্রহণ করে, কিন্তু কাছে ধরিতে গেলেই উহা কুয়াসার মত ধরা দেয়না।

রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষা ভাবনার সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাভাবনার সাদৃশ্য আছে। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করে এ বিষয়ে বলেছেন ঃ

> বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, মনুষ্যের সমুদয় বৃত্তিগুলির সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যবিধান দ্বারা উহাদের সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি সাধনই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

শাস্ত্রবিশেষে ব্যুৎপত্তি (specialization)কে রামেন্দ্রসুন্দর মেনে নেননি—কেননা এর মধ্যে একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণতা আছে। সমগ্র জাতির জাতীয় বলবৃদ্ধির অনুকূল এ শিক্ষাপদ্ধতি হতে পারেনা। শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সামাজিক পটভূমিতে বিচার করা প্রয়োজন। ব্যক্তিতন্ত্রতা ও সমাজতন্ত্রতা এই শব্দ দু'টি ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কে পরস্পর বিপরীত দু'টি থিওরী। এই মতেরই প্রচারক হার্বার্ট স্পেন্সর। আর একদল বলেন—যখন সমাজের কুশলের উপরেই ব্যক্তিগত কুশল নির্ভরশীল— তখন সমাজের মঙ্গলের জন্যে ব্যক্তিকে আপনার স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে। ব্যক্তিকে সমাজেরই অধীন হতে হবে। কিন্তু কোন্ শিক্ষানীতি উৎকৃষ্ট? সে সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলেন ঃ

উহাই প্রকৃষ্ট শিক্ষানীতি, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সমাজের, তাহার রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষণে সম্যকরূপে সমর্থ করে।

শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা হল ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৌর্বল্য দূর করে ব্যক্তির শক্তির স্ফূর্তি সাধন করে তাকে সমাজের বা রাষ্ট্রের অনুগত করে তোলা। রাষ্ট্রকে বলিষ্ঠ করে রাষ্ট্রের হিতসাধনই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষাব্যবস্থায় জাতিগঠনের আদর্শের উপরেই তিনি আত্যন্তিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর স্বাধীন চিন্তার প্রবর্তনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কে 'সমাজতন্ত্রকেই' স্বীকার করেছেন। সমষ্টি চিন্তার দ্বারাই তিনি চালিত।

'রাষ্ট্র ও নেশন' প্রবন্ধে তিনি সমগ্র নেশনের শক্তিকে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি এই দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। 'প্রজাসংঘ লইয়া নেশনের শরীর, সেই প্রজাসংঘের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনার্থই রাজশক্তি বর্তমান।'

'শিক্ষাপ্রণালী' নামীয় আর একটি প্রবন্ধে তিনি ব্যাপক অর্থে 'শিক্ষা' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। কি সেই অর্থ? 'যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব পুষ্টিলাভ করে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকাশ পায়, হীন মনুষ্যত্ব স্ফূর্তিলাভ করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়া ওঠে।'

য়ুরোপ ও ভারতবর্ষের রাজনীতি-ধর্মনীতি-সমাজনীতি ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি দুই দেশকে দুটি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন—য়ুরোপ কর্মপ্রবণ আর ভারতবর্ষ বৈরাগ্যপ্রবণ।

'নানাকথা'য় বাস্তব-ভিত্তিক পন্থায় ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে রামেন্দ্রসুন্দর জাতীয় জীবনের নানা সমস্যার অন্তস্তল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেছেন। সমস্যার উত্থাপনে তাঁর বুদ্ধিধর্মী মনের তীক্ষ্ণতা উপস্থিত—স্বদেশের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি সমস্যা-সমাধানের পথকেও যতটা সম্ভব বাস্তব করে তুলেছেন।

গ্রন্থভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর

উনিশ শতকের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভা। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি তাঁর বিপুলপাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধ মনীষার পরিচয় রেখে গেছেন। বিষয়নিষ্ঠা এবং মননশীলতায় তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান-ইতিহাস-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উপস্থাপনের মাধ্যমে বাঙলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে উন্নীত করেছেন। মনোধর্মের দিক দিয়ে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নের ভাব-চিন্তানায়ক তিনি, তাঁর বিভিন্ন রচনায় মনোধর্মের সেই প্রবণতার সচেতন প্রক্ষেপ আছে। স্থূল বস্তুজগৎ ও সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম জগতের মধ্যে সম্পর্ক ও স্বরূপ বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য বস্তুবিজ্ঞানের অনুশীলন যেমন করেছেন—'ভারতীয় মোক্ষশাস্ত্রের' উপরে অসংশয়িত অধিকার বিস্তার করে দুই যুগ সীমার মধ্যে সমন্বয় সম্ভবপর করে তুলেছিলেন।

বিপুল জ্ঞান ও অদম্য কর্মধারার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর জীবনে সংগঠনমূলক অনেক কাজও সাধন করেছেন, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের নানামুখী কর্মধারার মধ্য দিয়ে তাঁর গঠনশীল ও কর্মবীর মন নিজেকে শতধারায় উৎসারিত ও উচ্ছলিত করে দিয়েছে। দুঃসাধ্য গবেষণাকে তিনি কর্মব্রতরূপে গ্রহণ করে তাকে 'নির্ধূম আলোক-রেখায় উদ্ভাসিত করে' তুলেছিলেন। সূক্ষ্মবিচারে দেখা যাবে এই 'আলোক রেখায় উদ্ভাসনা' বৃত্তিটি তার স্বভাববৈচিত্র্যের একটি পরমতম পাঠ। এরই পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে অপরের গ্রন্থে তাঁর অসংখ্য ভূমিকা রচনার মধ্যে, গ্রন্থনিহিত বক্তব্যকে সামনে রেখে তিনি যে ভূমিকা প্রণয়ন করেছেন—মৌলিক স্বভাবের বৈশিষ্ট্য তাকেও স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করেছে। গ্রন্থভূমিকাগুলি গবেষণায়, চিন্তা ও মননের স্পর্শে, রসবোধের সান্নিধ্যে ও কুশলী বিশ্লেষণের আশ্রয়ে স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। রামেন্দ্র প্রতিভা বিচারণার এই অপ্রধান দিকটিও তাই নগন্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৯৫ শকাব্দে জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন—'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূলমর্ম' রচিত হবার প্রায় চব্বিশ বছর পরে রামেন্দ্রসুন্দরের সম্পাদনায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা লেখককে যে জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তারই অসংকোচ বিবৃতি তিনি প্রথমেই দিয়েছেন ঃ

> একটা কারণ পরলোকগত লেখকের রচনায় হস্তক্ষেপে অপরের কতটা অধিকার আছে, তাহার নিরূপণ দুরূহ। আর একটা কারণ আমার কৃতকার্য বা অকার্যের জন্য পাঠক হয়ত লেখককে দায়ী করিতে পারেন এই আশঙ্কা।

এই গ্রন্থেরই ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর একটি বাস্তব সমস্যার উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, বিজ্ঞান প্রচারের উপযোগী ভাষার মানদণ্ড সৃষ্টি হয়নি। বিজ্ঞানের ভাষাকে গড়ে তুলতে পারলেই যে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নের প্রসার সম্ভব—সে বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তুর বিচারকালে বিজ্ঞানশাস্ত্র যে দ্রুত উন্নতিশীল সেই মৌলিক বিষয়ের প্রতিও তিনি আলোকপাত করেছেন। চিন্তাপ্রণালীকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সংগে সংগত করে তুলবার যে নির্দেশ দিয়েছেন—সাহিত্য চিন্তায় রামেন্দ্রসুন্দরের আপন স্রষ্টা সত্তার পরিচয়ই তার মধ্য দিয়ে উদ্‌ঘাটিত হয়ে ওঠে।

'বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে' একদা বাংলাদেশের সকলপ্রকার আঞ্চলিক সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়াস গৃহীত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার বালকমনের চিত্তাকর্ষক যে 'খুকুমণির ছড়া' প্রণয়ন করেছিলেন, সেই অভিনব প্রয়াসের পরিচয় দিয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর গ্রন্থখানির ভূমিকা রচনা করে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই জাতীয় ছড়ার সংগ্রহ কার্যে আত্মনিয়োগ করে বাংলার লোকসাহিত্যেকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়াসের ফলযে দূরতর ও প্রশস্ততর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হবে—এ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর নিঃসংশয় ছিলেন।

শিশুজনপ্রিয় এই ধারার সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে নিষ্কাশন করতে চাননি। কিংবা এর মধ্যে ইতিহাসের কোন দূর-বিস্তৃত অধ্যায় আবিষ্কারেও তিনি সমর্থ নন। তবে এ-জাতীয় জাতির সম্পদকে রক্ষা করবার দায়িত্ব তিনি উচ্চারণ করেছেন। লুপ্তপ্রায় স্মৃতিচিহ্নগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে। এই বিষয়ে অবহেলা করলে 'ভবিষ্যতের নিকট মার্জনার অধিকারী হইবে না', ইতিহাসের প্রতি আমরা যে অনুরাগ সম্পন্ন নই—তার কারণরূপে তিনি বৈজ্ঞানিকতার অভাবকেই নির্দেশ করেছেন। বিজ্ঞানের প্রতি বিকর্ষণ সত্যের প্রতি বিরাগকেই প্রমাণ করে।

ভারহীন সহজরসের সঞ্চয় এই ছড়াগুলিতে মানুষের জীবনের একটা বৃহৎ অংশের দুর্জ্ঞেয় রহস্য অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে। মানুষের শৈশব জীবনের মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতির পর্যালোচনায় এ জাতীয় ছড়ার গুরুত্ব অত্যধিক। এ-কথা ঠিক আমাদের কার্যাবলী যে পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করে আমাদের জীবনযাত্রায় স্বাভাবিক সাফল্য সেই পরিমাণেই আসে। পূর্ণবয়স্কদের মন পর্যা-লোচনার ক্ষেত্রে নিয়ম ও শৃঙ্খলার এই অস্তিত্ব থাকলেও শিশুর জগতে এ-সব কিছুরই বৈপরীত্য। শিশুমনস্তত্ত্বের উপর রামেন্দ্রসুন্দর যে মন্তব্য করেছেন—তা তাঁর সাহিত্যিক সত্তা ও রসবোধের সমন্বয়েই সম্ভব হয়েছে :

> প্রকৃতির কারখানা হইতে নির্মিত হইয়া মানবশিশু সদ্য : সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও প্রকৃতির শাসন, নিয়মের শাসন তাহাকে বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে নাই ; যে নিয়মের প্রভাবে সেই কারখানা পরিচালিত হইতেছে, সেই নিয়মের অস্তিত্বে তাহার একেবারে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই।

শৃঙ্খলহীন, নিয়মরহিত, বিপর্যস্ত জগতের মধ্যে শিশুমনস্তত্ত্ব পরিপূর্ণ আন্তরিক উল্লাস অনুভব করে। বয়স্ক মানবের চরিত্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। কিন্তু পৃথিবীর শিশুচরিত্র সর্বকালে সর্বদেশে একই

রকম। স্নেহবিবশা জননীর অপত্য স্নেহ যেমন মানবচরিত্রের কৃত্রিমতার অন্তরালে সরিয়ে আপন স্বতঃস্ফুত বিস্ময়ে মূর্তিকে প্রকাশ করে —'চীন হইতে পেরু পর্যন্ত' এচরিত্র সর্বকালেই একরকম।

এই সমস্ত অসংলগ্ন ছড়ার ভগ্নাংশগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও হয়তো গৃহস্থ বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের রূপকল্পের সন্ধানও পাওয়া যায়। বাঙালীর স্বভাবের ভাণ্ডার থেকে রং ঘনিয়ে উঠেছে এ গুলিতে —কৃত্রিমতার অনেক উর্ধ্বে তাই এ সাহিত্য। বিশ্বসংসারের সকল কিছুই কৌতুকময় ও বিশৃঙ্খলার আনন্দেও কলরবে পরিপূর্ণ। এদিক দিয়ে খুকুমণির ছড়ার কৃতকার্যতার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর।

'ছড়া ও গল্পের' ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন—পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ এদেশে অতি প্রাচীনকালে ছেলেদের জন্যেই রচিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতশিক্ষার্থী বালকদের জন্যে কয়েকটি গল্প 'ঋজুপাঠ' প্রথমভাগে সংকলন করেছিলেন। কথামালা গ্রন্থে বিদেশী গল্পের সংকলন করলেন—কিন্তু স্বদেশী গল্পগুলিতে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি কেন পড়েনি—এবিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের মনে বিস্মিত জিজ্ঞাসা জেগেছে। অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'অধ্যাপকোচিত গাম্ভীর্যের অবতার হওয়া সত্বেও সরল ও তরল ভাষার আশ্রয়ে যে ছেলে ভুলাইতে প্রবৃত্ত' তা দেখে রামেন্দ্রসুন্দর বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন।

৩

অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের জন্যে বিজ্ঞানপরিচিতির টুকরা সংকলন 'প্রকৃতি-পরিচয়' গ্রন্থের একখানি ভূমিকাও রামেন্দ্রসুন্দর প্রণয়ন করেছিলেন। গ্রন্থখানির লেখক জগদানন্দ রায়। বিজ্ঞানের উচ্চ তত্ত্বকে জনমনের দ্বারে পৌঁছে দেবার যে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন— তার জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁকে সর্বতোভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিনয়কুমার সরকার লিখিত 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধে'র ভূমিকায়

রামেন্দ্রসুন্দরের ইকিহাসের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশিত হয়েছে। দুঃখের সংগেই তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

> অন্যদেশে যাহাকে ইতিহাস বলে এদেশে তাহা নাই। অতীতের তত্ত্ব এদেশ রাখিতে চাহে না। 'স্বদেশের অতীতকেই ভুলিয়া গিয়াছে বিদেশের ত কথাই নাই।

অথচ এই অতীতের কথা আলোচনায় ভাবুকের মন স্তম্ভিত হয়। দার্শনিকের চিত্ত দিশেহারা হয়। গ্রন্থখানির মধ্যে অতীত ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে ও তার বিবৃবিতে বিনয়কুমার যে আকাঙ্ক্ষার ও আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন—তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর।

'সংগীত-রাগকল্পদ্রুম' নামীয় গ্রন্থখানির পুনঃপ্রচারের জন্যে লালগোলারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এক আবেদন জানান। গানগুলি সাধ্যমত সংশোধন করে সংগীতজ্ঞের সাহায্যে স্বরলিপি প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। প্রাচাবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর সহায়তার একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। গ্রন্থখানির গ্রন্থকর্তা কৃষ্ণানন্দ ব্যাস। গ্রীয়ার্সন হিন্দী সাহিত্যের বিবরণ লিখতে বসে এই গ্রন্থ থেকেই আনুকূল্য পেয়েছিলেন। রাজা বাহাদুর এ গ্রন্থের সমুদয় স্বত্ব সাহিত্য পরিষৎকে দিয়েছিলেন। গ্রন্থবিক্রয়লব্ধ অর্থ পরিষৎ কর্তৃক সংগীত সাহিত্য প্রচারের জন্যে ব্যয়িত হবে—এ বিষয়েরও উল্লেখ রামেন্দ্রসুন্দর করেছেন।

'আদর্শ জীবনী'নামে একখানি গ্রন্থ ১৩১৬ সালে রচনা করেছিলেন। বাংলাদেশের কাতিপয় মহাপুরুষের জীবনচরিত এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। মনস্বী যে সমস্ত মহাজন বাংলার জাতীয় জীবনের গঠনে সহায়তা করেছেন—তাদের চরিত্র যে আমাদের সম্মুখে নতুন আদর্শ স্থাপন করে আমাদের গন্তব্যপথকে নির্বাচিত করে দেবে—এই আশাই রামেন্দ্রসুন্দর পোষণ করেছেন।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' মুখবন্ধ রচনা করে রামেন্দ্রসুন্দর বাংলাসাহিত্যের নবাবিষ্কৃত একটি দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন। ভাষারীতি ও উপলব্ধির সুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করেছেন তিনি।

গ্রন্থভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় আছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতি

'কাব্যালোক' গ্রন্থে ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত রচনার 'ষ্টাইল' প্রসংগে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> আবার ষ্টাইলেরও খাঁটি বাংলা 'সাহিত্য'। কবি আত্মার সহিত বস্তু ও শব্দার্থের মিলনেই তো জন্ম লয় আসল সাহিত্য। তাই কবিই তো সাহিত্য বা ষ্টাইল।

প্রকরণ ও আঙ্গিক নিয়ে ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে বিস্ময়কর বিদগ্ধ আলোচনা হয়েছে—কিন্তু বিশিষ্ট 'ষ্টাইল' বা শৈলীর ধারণা প্রতীচ্য। প্রাচ্য অলংকার শাস্ত্রে রচনারীতিতে বৈদর্ভী, গৌড়ীয় কিংবা পাঞ্চালী শৈলীর পরিচয় লাভ করা যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য 'ষ্টাইলের' ধারণার বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি সেখানে নেই। 'ষ্টাইলের' মধ্যে একটা ব্যক্তিত্বের রস ও স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা থাকে। কিন্তু 'ষ্টাইলে' কি শুধুমাত্র ব্যক্তিত্বেরই স্বীকৃতি? ষ্টাইল লেখকের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি হলেও ব্যক্তিত্বের পরিমিতিকে অতিক্রম করবার বিশিষ্ট ক্ষমতা তার মধ্যে আছে। ব্যক্তিগত হয়েও তা নৈর্ব্যক্তিক—'highest style is that wherein the two current meanings of the word blend ;it is a combination of maximum of personality with the minimum of impersonality" ষ্টাইলে লেখকের অন্তর্স'ত্তার গুরুত্ব যথেষ্ট—রুস্যকের ভাষায় তা 'রসানুকূল চর্বণা'—পেটারের মতে সেই ভাষা—"language faithful to the colouring of spirit"—কিন্তু তার মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের ঐক্য আনতে হয়। কেননা, "All the laws of good writing aim at similar unity or identity of the mind in all the process by which the word is associated to its impost." লেখকের যথার্থ স্বরূপকে এই 'ষ্টাইলই' নির্দেশ করে দেয় —লেখকের মনোজীবন, আত্মিক স্বরূপ বা ব্যক্তিত্বের সর্বন্ধর প্রকাশ

ক্ষেত্র এই ষ্টাইল। ষ্টাইলের আয়তন ব্যাপক—'Style is the man'; যেখানে রচনা ও রচয়িতার অন্বয়বাদ সেখানেই শ্রেষ্ঠ ষ্টাইল।

বাংলা গদ্যরীতির বিশিষ্ট কর্ষণার ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনারীতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রচনারীতির মধ্যে সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই রামেন্দ্রসুন্দর 'প্রাণ' রূপে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন :

> কেবল নীতিশাস্ত্র কেন, যদি কেহ দর্শনশাস্ত্র বা রসায়নশাস্ত্রকেই নবেলের বিষয় করিতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি করিব না। কিন্তু বিষয়টি যদি সুন্দর না হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্য হয়না।

রামেন্দ্রসুন্দরের মতে 'মানবজীবনের ও জগৎসংসারের গোড়ার কথাগুলি যিনি সুন্দর করে দেখাতে পারেন—তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদের কাজের মধ্যেও এই 'সুন্দরে'র প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। রচনারীতির সাহিত্যিক গুণ সম্বন্ধে এই জাতীয় একই স্পষ্ট সচেতনতা রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তর্জীবনেরই বৈশিষ্ট্য। তাঁর গদ্য-রীতির মধ্যে জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও রসবোধের একটা অখণ্ড ভারসাম্য ছিল।

২

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহনের মধ্যে যে নির্মোহ জ্ঞান-বাদের সূচনা দেখা গিয়েছিল—তার শিল্পরীতি ছিল 'ভৌম চেতনালব্ধ'। বিষয় ও রীতি উভয় দিক দিয়েই তিনি সাধারণের উপলব্ধির সীমায় আসেননি। বিদ্যাসাগরের কর্মময় ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি 'ভূমিচারী' মানব প্রেমিক মন ছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত বাংলা প্রবন্ধ নিবন্ধের মধ্যে জাতির মনের 'আকার-আয়তন' পরিবর্তিত করবার এক বিপুল চেষ্টা সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামমোহন পরবর্তী যুগে জাতীয় চেতনায় যে তন্দ্রাচ্ছন্নতা এসেছিল—যুক্তিবাদ ও বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বকে সেদিনের সেই 'তামসিকতা' অপনোদনে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর বিচিত্র প্রচেষ্টাকে

সামগ্রিক বাস্তব রূপদানের জন্যে তিনি নানা পুস্তক রচনা করেছেন, শিক্ষাসংস্কারের সংকট হেতু পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন, অনেক সময় তাঁর প্রতিপক্ষদের উত্তর দিতে গিয়ে তাঁকে বাদপ্রতিবাদ মূলক পুস্তিকাও রচনা করতে হয়েছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিবর্তনে এ গুলির মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর আপনার স্থানকে সুচিহ্নিত করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে তিনিই 'বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী'। বাংলা গদ্যে কলা নৈপুণ্যের সংযোগে কায়া ও কান্তি দান করেছেন বিদ্যাসাগর।

বাংলা গদ্যরীতি মিশনারী সম্প্রদায়ের দানে গড়ে ওঠেনি—কোন একজন সমালোচক এ জাতীয় মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে পয়ার ও ত্রিপদী জাতীয় ছন্দকেই তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন—সে যুগে তারই মাধ্যমে বৃহত্তর মননকার্য সম্পাদিত হত। উনিশ শতকের বাঙালা নিজের চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজের ভাষার মধ্যেই নিজের আবেগ ও মননের রূপদান করতে চেয়েছে এবং বিস্ময়ের সংগে আবিষ্কার করেছে যে এগুলি স্বকীয় আবেগের আশ্রয় হতে পারে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগে বাংলাগদ্যের শৈশব-দশা। সে ভাষায় সাহিত্যিক সৌরভ কিংবা কৌলীন্য ছিল না। সাধু ও কথ্য ভাষারীতির মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের যে একটা লক্ষণীয় প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল—সে কথা হয়তো অস্বীকার করা চলেনা।

বিদ্যাসাগর—অক্ষয়-দেবেন্দ্রনাথ পর্বে সমসাময়িক 'তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা' বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিল। তাঁদের রচনারীতির মধ্যেও 'যুগের আকাঙ্ক্ষা' অভ্রান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে। অক্ষয়কুমারের রচনায় পাশ্চাত্য যুক্তিনিষ্ঠা ও বিপুল জ্ঞানৈষণা থাকলেও সার্থক 'ষ্টাইল' সেখানে আসেনি। বাংলাগদ্যে 'মধ্যগা রীতির' প্রবর্তক বিদ্যাসাগর। ম্যাথু আর্নল্ড গদ্যের পাঁচটি গুণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন—ভারসাম্য (Sanity), কৌতুকরস (Humour), অন্তর্মুখী ভাবচেতনা, দৃশ্যগত চিত্রকল্প ও শ্রুতিধর্মী উপমা। বিদ্যাসাগরের হাত এই জাতীয়

সুসংবদ্ধ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরীয় রীতির এই অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব পুর্ণরূপে উদঘাটিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রে। বিদ্যাসাগরের সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের পার্থক্য কোথায়? সৃষ্টিধর্মী প্রেরণা বিদ্যাসাগরে ছিলনা—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তিত্বের মধ্যে ভাষার রস ও যুক্তির ঐশ্বর্যে স্বষ্টিধর্মী সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব পুর্ণমাত্রায় উদঘাটিত।

মৌখিক ভাষাপ্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র লেখকের প্রাপ্য। মূলতঃ পণ্ডিতী ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া থেকেই তাঁদের মধ্যে একটি স্বষ্টিশীল ভাষান্দোলনের প্রেরণা এসেছিল। তবে আঞ্চলিকতার একটি অতি-নিরূপিত সীমা তার মধ্যে এসে গেছে। বাংলা গদ্যরীতির এ বিবর্তনের ইতিহাস বিরাট ও বহুবিচিত্র। তার প্রত্যেকটি পর্বের স্বরপোউদঘাটানায় আমাদের প্রয়োজন নেই।

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতি পূর্ববর্তী এ জাতীয় পটভূমিকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে স্বীকরণ করে নিয়েছে অবশ্যই। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতিতে পরীক্ষামূলকতার পর্বটি খুব অল্পসীমার। প্রাথমিক কয়েকটি রচনামাত্রেই তাঁর সে অপূর্ণতা চোখে পড়ে। এ-ছাড়া তাঁর সমগ্র রচনাই স্বয়ংস্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত।

৩

বঙ্কিমপর্বেই রামেন্দ্র প্রতিভা আপন বিশিষ্ট স্বষ্টিমুখকে খুঁজে পেয়েছিল। এ সময়ে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রথম দিকে কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'নবজীবন' পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাকে 'সম্পাদকের ছুরিকাঘাতে' ক্ষত-বিক্ষত করেছিলেন। 'গুরুমহাশয়' সেদিন রামেন্দ্র-স্থন্দরের ভাবী সাহিত্যরীতিরই পথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। অকারণ অতিশয়িত উচ্ছ্বাসের বাগ্‌বিভূতি থেকে মুক্ত হলেন রামেন্দ্রসুন্দর—স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও বিশ্লেষণনিপুণ করে তিনি মনের ভিত্তি গঠন করলেন। মানসিকতার উপযুক্ত ভাষা তৈরী করতে তাঁকে বেশীদিন শিক্ষানবিশ হতে হয়নি।

প্রাক্-রামেন্দ্র পর্বেও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিপুল অন্বেষণ ও অনুশীলন হয়েছে। কিন্তু তুরূহ জটিল বিষয়কে অভিনব প্রকাশরীতির মধ্য দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর নব-পথিকৃতের ঐতিহাসিক মূল্য সংযোজন করেছেন বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে।

বিজ্ঞান ও দর্শনবিদ্যার বহুবিচিত্র দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। কিন্তু জাগ্রত রসবোধ সমস্ত পাণ্ডিত্যকে বিনম্র এক ধরণের বিশিষ্ট ঐশ্বর্য দান করেছে।

বিজ্ঞানকে সাধারণের উপলব্ধি ও রসাবেদনের দ্বারে পৌঁছে দেবার জন্যে তিনি বক্তব্যকে যতটা সম্ভব সহজ করেছেন। সহজ বৈঠকী মেজাজ অনেক সময় কথোপকথনাত্মক ভংগীতে ব্যক্ত হয়েছে :

> ভূমণ্ডলটা যদি কিছুদিনের মধ্যে ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেবের এই বয়সে বাণপ্রস্থ অবলম্বনের পরিবর্তে আইরিশ হোমরুল লইয়া এত হঙ্গামা করা ভাল হয় নাই।

'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রমাণে তিনি প্রত্যক্ষাত্মক জগৎ থেকেই উপমা আহরণ করেছেন। হাস্যরসের একটি জ্যোতির মধ্য দিয়ে বক্তব্যকে স্পষ্টোজ্জ্বল করে তুলেছেন। হাস্যসুন্দর রামেন্দ্র-সুন্দরের রচনারীতির এ বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর। রচনারীতির মধ্যে একটা অনায়াসকৃত সাবল্য উপস্থিত। প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে শিক্ষক রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর আন্তরিকতা, সারল্য ও নিষ্ঠা নিয়েই উপস্থিত।

শিক্ষাসংস্কারক রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর ঐ বিষয়ক ভাবনাচিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধে সমাজ-চিন্তানায়কের একটি স্পষ্ট নির্দিষ্ট পরিচয়ও রেখেছেন। যুগের সংগে সামঞ্জস্যে তিনি যে আপন চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন—তার পরিচয় 'নানাকথা'র প্রতিটি প্রবন্ধ। যুক্তি ও বিচার সেখানে বিজ্ঞাননিষ্ঠা দিয়েই শাসিত। মাঝে মাঝে তাঁর দৃষ্টিতে বিদ্রূপাত্মক তীক্ষ্ণ সমালোচনা জেগেছে—ভাষারীতির সংযমের মধ্য দিয়ে মূল বক্তব্য আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে :

ইংরাজী বিদ্যা না শিখিলে আমাদের মনুষ্যত্ব জন্মিবে না। সাব্যস্ত হইবামাত্র বিলাতী সরস্বতী দশমাসের অপেক্ষা না রাখিয়া একেবারে কতকগুলি শ্বশ্রুগুম্ফধারী সুপক্ক সন্তান প্রসব করিলেন ; এবং অকস্মাৎ দেশমধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কেহ আশা করিলেন ভারতমাতা অচিরেই হিমাচলের উচ্চতম শিখরে উন্নীতা হইবেন।১

'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' চিন্তায়—স্থবির অকর্মণ্য মানুষকে তিনি একটি তুলনার মধ্য দিয়ে শ্লেষ করেছেন—ত্রিশ কোটি মনুষ্যের সমবায়ে গঠিত একটি সমগ্র জাতি ইউলিসিসের দৃষ্টি লোটাস্ ঈটারের মত নেশার ঘোরে ঝিম ধরিয়া বসিয়া আছে।'

এইজাতীয় রচনারীতির মধ্যে আছে—সাহিত্যিক বক্রোক্তির সৌরভ। তাঁর 'অরণ্যে রোদন' নামীয় প্রবন্ধটি এ জাতীয় মানসিকতার রসে বিশিষ্ট। অপ্রত্যক্ষ বস্তুর মধ্যে দৃশ্যগত চিত্রকল্প এনে তাকে অন্তর্মুখী ভাব চেতনার আশ্রয়েও তিনি কখন কখন প্রকাশ করেছেন :

সেইদিন মহানিশায়, যখন বাত্যাসংক্ষুব্ধ মহাসাগর প্রশান্ত হইয়াছে, যখন সেই মহাসাগরের পৃষ্ঠের উপর নিবিড় অন্ধকার ঘনায়মান হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, যখন অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীর অধিনেতার প্রতি লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, সেইদিন মহানিশায়, যখন বাত্যাসংক্ষুব্ধ মহাসাগর প্রশান্ত হইয়াছে, যখন সেই মহাসাগরের পৃষ্ঠের উপর নিবিড় অন্ধকার ঘনায়মান হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, যখন অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীর অষ্টাদশ দিনব্যাপী উন্মত্ত রণকৌশল মৃত্যুর নিস্তব্ধ নীরবতায় শ্রান্তিলাভ করিয়াছে……সেই নিবিড় অন্ধকারকে দীপ্ত করিয়া অশ্বত্থামার মুক্ত কৃপাণ পরিশ্রান্ত সুখসুপ্ত অসহায় পাণ্ডব-সৈনিকগণের, পাণ্ডব-বান্ধবগণের ও পাণ্ডব-পুত্রগণের কণ্ঠ হইতে রক্তস্রোত ঢালিতে লাগিল।২

১ ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম : 'নানাকথা'

২ ধর্মের জয় : কর্ম-কথা

বিচিত্রিত কল্পনার প্রবাহে, দীর্ঘ শব্দগ্রন্থিতে একটি গভীর ধ্বনির উদাত্ত মহিমা ও বর্ণনার মনোজ্ঞতা রামেন্দ্র মানসিকতার ও গদ্যরীতির এক বিশিষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্ণের উদ্বেলতা কিংবা চিত্ররসের মধ্যে তিনি ভাবের ভারসাম্য থেকে বিচ্যুত হননি। এর পশ্চাতে তাঁর বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও নৈয়ায়িক সিদ্ধিই কার্যকর।

সাহিত্য চিন্তায় রামেন্দ্রসুন্দর যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন—তার মধ্যে সামগ্রিক অনুভবের সংগে আছে একটা বিরলদৃষ্ট অন্তর্জীবন। সে দৃষ্টি রসজ্ঞেরই দৃষ্টি বটে। দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ রচনাতেও তিনি ভাবসর্বস্ব বা ইংগিতমুখর কথা বলার পক্ষপাতী ছিলেন না। রসদৃষ্টির আনুকূল্যে তথ্য ও বস্তুর উপস্থাপন এবং উপমাচয়ন বক্তব্যকে রসনিষ্ঠ ও জ্ঞানগর্ভ করে তুলেছে। উপমাচয়নে রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচীন ভারতীয় ঐশ্বর্যের মধ্যেই নিজেকে নিবিড় শ্রদ্ধায় নিমজ্জিত রেখেছেন। সরস বর্ণনাভংগী ও দুর্লভ শিল্পকুশলতায় তাঁর রচনারীতি সমৃদ্ধ। জটিল তত্ত্বসংক্রান্ত আলোচনার মধ্যেও কুশলী রচনারীতি দিয়েই তিনি বক্তব্যের ধ্রুবত্ব যেমনি প্রমাণ করেছেন—তেমনি বিশিষ্ট রচনারীতির স্বাক্ষর রেখেছেন।

বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তনে রবীন্দ্রনাথের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভাষার ঐশ্বর্যময় রীতির পরীক্ষা করছে—ভাষার স্বতন্ত্র বৈভব অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা রমণীয়তার আশ্রয়ে বক্তব্য বস্তুর বিশ্লেষণ-তীক্ষ্ণ কলাকৌশলের উদ্দেশ্য থেকে কখনও ভ্রষ্ট হয়নি। একটা ভারসাম্যই তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল কথা। গদ্যের ভংগী প্রাধান্য সেখানে অনুপস্থিত।

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির আলোচনায় সমসাময়িক আরও দু'জন আলোচ্য—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী। বলেন্দ্রনাথের গদ্য রীতিকে রামেন্দ্রসুন্দর সপ্রশংস অনুমোদন জানিয়েছিলেন। সংচিত্রিত গদ্যরীতি ও আবেগ বলেন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছে—তিনি ভাবের কলাপবিস্তারী উন্মীলনপন্থী রূপকার। সমালোচক সে ভাষাকে 'অসাধারণ স্মৃতিচিত্রময় অনুভূতির আরোহী' রূপে চিহ্নিত করেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে উদ্দেশ্যের সচেতনতা ও সদা-তির্যক গতি ভাষাকে কৃত্রিম করে তুলেছে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের রচনারীতি কৃত্রিমতার উর্ধ্বে—গাম্ভীর্য ও সরস-ব্যক্তিত্বের স্পর্শে উজ্জ্বল। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির ক্ষেত্রে চলতি ভাষায় রচিত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' একটি অনবদ্য সৃষ্টি। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য বক্তব্য-অতিক্রমী হয়ে কখনও দেখা দেয়নি।

বঙ্কিমযুগের লেখক হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির সংগে রামেন্দ্রসুন্দরের মূলত পার্থক্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে জাতীয়তার একটা ব্যাপক সৃষ্টি প্রয়াস—একটা nation building spirit আছে। তার প্রবন্ধে বহুভাষণের পরিবর্তে আছে পরিমিতিবোধ ও স্বয়ংক্রিয় স্পষ্টতা। জ্ঞানাশ্রিত দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র রসবোধের কাছাকাছিও এসেছেন অনায়াস সাবল্যে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রীতিকে রামেন্দ্রসুন্দর আরো সহজ করে রসের ও রমণীয়তার ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতি সার্থক 'ষ্টাইলের' ভিত্তিতে ভাস্বর। ভাষারীতি ও শব্দকথার ক্ষেত্রে তিনি নিজেও যে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন—এইসংগে সে কথাও স্মরণীয়।

রামেন্দ্র রচনাপঞ্জী

১। প্রকৃতি। আশ্বিন ১৩০৩ (৭ অক্টোবর, ১৮৯৬)
প্রবন্ধগুলি নবজীবন, সাধনা, সাহিত্য, দাসী এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান, এই ক'টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

২। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা। (ফতেসিংহ জমিদারীর ইতিবৃত্ত) ভাদ্র ১৩০৭, ইং ১৯০০।

৩। জিজ্ঞাসা। ফাল্গুন ১৩১০ (১৬ মার্চ, ১৯০৪)

৪। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। চৈত্র ১৩১২, ইং ১৯০৬।

৫। মায়াপুরী। ১৩১৭ সাল (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯১১)

৬। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ১ আশ্বিন ১৩১৮, ইং ১৯১১।

৭। কর্ম-কথা। ১৩২০ সাল (১৩ নবেম্বর ১৯১৩)

৮। চরিত-কথা। ৫ ভাদ্র ১৩২০ (৮ নবেম্বর, ১৯১৩)

৯। বিচিত্র প্রসঙ্গ। ভাদ্র ১৩২১, ইং ১৯১৪।

১০। শব্দকথা। ১ বৈশাখ ১৩২৪, ইং ১৯১৭।
"সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব এবং বাঙ্গলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম,—শব্দ-কথা নাম দিয়া প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

মৃত্যুর পর প্রকাশিত

১১। বিচিত্র জগৎ। ৮ আগস্ট, ১৯২০।
("ভারতবর্ষ হইতে পুনর্মুদ্রিত")

১২। যজ্ঞ-কথা। ১০ ভাদ্র ১৩২৭ (৩ অক্টোবর, ১৯২০)
"যজ্ঞকথার প্রবন্ধগুলি প্রথমে—বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে পঠিত হইয়াছিল এবং পরে 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল।"

১৩। নানা-কথা। আশ্বিন ১৩৩১, ইং ১৯২৪।

"এই সকল প্রবন্ধ আমাকে বহু পুরাতন ও লুপ্ত মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা হইতে বহু অনুসন্ধান ও পরিশ্রমে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে"

১৪। জগৎ-কথা। ইং ১৯২৬।

এই পুস্তকের কিয়দংশ স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর রচিত পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা :—

১। Aids to Natural Philosophy. (14 Oct. 1891)

২। পদার্থবিদ্যা (সচিত্র)। (৩১ জুলাই ১৮৯৩)

৩। ভূগোল। চৈত্র ১৩০৪, ইং ১৮৯৮।

৪। বিজ্ঞানপাঠ, ১ম ও ২য় মান। ১৩০৯ সাল (৩১ জুলাই, ১৯০২)

৫। বিজ্ঞান-কথা। (উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার্থিগণের জন্য)

৬। A Geographical Reader. (22 March, 1902)

রামেন্দ্রসুন্দর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকার তালিকা :—

১। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূলমর্ম : হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৮১৯ শক বৈশাখ (ইং ১৮৯৭)

২। খুকুমণির ছড়া : যোগীন্দ্রনাথ সরকার—১৩০৬, আষাঢ়

৩। স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী—১৩১৪ সাল

৪। ছড়া ও গল্প : ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—১৩১৭, কার্তিক

৫। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস (৪র্থ সংস্করণ) : রজনীকান্ত গুপ্ত—১৩১৮, বৈশাখ

৬। প্রকৃতি পরিচয় : জগদানন্দ রায়—১৩১৮, আষাঢ়

৭। কালের স্রোত : যোগেশচন্দ্র সিংহ—১৩১৮ সাল

৮। ব্রতকথা ঃ কিরণবালা দাসী—১৩১৯ সাল

৯। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ঃ বিনয়কুমার সরকার—ইং ১৯১২ সাল

১০। আকাশের গল্প ঃ যতীন্দ্রনাথ মজুমদার—১৩২০

১১। অভয়ের কথা ও ঠাকুরাণীর কথা ঃ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় —১৩২২, আশ্বিন

১২। মন্দির (কাব্য) ঃ কিরণচাঁদ দরবেশ—১৩২২, মাঘ

১৩। সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম, ৩য় খণ্ড—১৯৭৩ সংবৎ (ইং ১৯১৬)

১৪। চণ্ডীদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ঃ বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত— —১৩২৩ সাল (ইং ১৯১৭)

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনার তালিকা ঃ

১৩০০, শ্রাবণ-ভাদ্র	—সাহিত্য ও বিজ্ঞান—		নিকলা তেস্‌লা
ভাদ্র	—	জন্মভূমি	— ফটোগ্রাফি
পৌষ	—	সাহিত্য	— বৈজ্ঞানিক সংবাদ
১৩০১, ভাদ্র	—	সাহিত্য	— বৈজ্ঞানিক সংবাদ
১৩০২, ভাদ্র	—	মুকুল	— আমরা কি খাই ? (শিশুপাঠ্য)
আশ্বিন	—	মুকুল	— মেরুপ্রদেশ
কার্ত্তিক	—	সাহিত্য	— ঐতিহাসিক কথা
ফাল্গুন	—	মুকুল	— নিউটনের কীর্ত্তি (শিশুপাঠ্য)
১৩০৩, ১ম সংখ্যা	—	সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	— গৌরীমঙ্গল
১৩০৪, আষাঢ়	—	সখা ও সাথী	— ভূমিকম্প (শিশুপাঠ্য)
১৩০৫, আশ্বিন	—	মুকুল	— গাছের আহার (শিশুপাঠ্য)
১৩০৬, বৈশাখ	—	মুকুল	— ঊনবিংশ শতাব্দী (শিশুপাঠ্য)

আষাঢ়	—	মুকুল	— জ্যোতিষের কথা (শিশুপাঠ্য)
	২য় সংখ্যা	— সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	— কাশীরাম দাসের বংশ-পরিচয় ও কালনির্ণয়
	৩য় সংখ্যা	— সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	— 'অলঙ্কার শাস্ত্র' প্রবন্ধের আলোচনা
	৪র্থ সংখ্যা	— সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	— ভৌগোলিক পরিভাষা
	৪র্থ সংখ্যা	— সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	— একখানি প্রাচীন দলিল
১৩০৭,	১ম সংখ্যা	— সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	— চম্পক কলিকা
	৩য় সংখ্যা	— সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	— ভাষাতত্ত্ব (আলোচনা)
	৪র্থ সংখ্যা	— সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	— 'রাঙ্গামাটি' বা 'কর্ণসুবর্ণ' প্রবন্ধের আলোচনা
১৩০৮,	১ম সংখ্যা	— সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	— কাশীরাম দাস
		সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	— আর একখানি প্রাচীন দলিল
	ভাদ্র	— সাহিত্য	— অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার
	আশ্বিন	— বঙ্গদর্শন	— অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার (সচিত্র)
	মাঘ-ফাল্গুন	— প্রদীপ	— জড় ও চৈতন্য
১৩১০,	১ম সংখ্যা	— সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	— ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	চৈত্র	— বঙ্গদর্শন	— গণেশ প্রসঙ্গ (আলোচনা)

১৩১২,	বৈশাখ	বঙ্গদর্শন	রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ
		ভারতী	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
		ভাণ্ডার	আজকালকার পাব্লিক উদ্‌যোগগুলির সঙ্গে প্রাকৃতসাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি ? প্রশ্নের উত্তর।
	জ্যৈষ্ঠ	ভাণ্ডার	আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভাল কি মন্দ ? প্রশ্নের উত্তর।
		ভাণ্ডার	প্রশ্ন
	শ্রাবণ	ভাণ্ডার	ভারতবর্ষের ইতিহাস
	অগ্রহায়ণ	বঙ্গদর্শন	স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়
১৩১৪,	১ম সংখ্যা	সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	গ্রাম-দেবতা
	আশ্বিন	প্রবাসী	"ব্যাধি ও প্রতিকার" আলোচনা
১৩১৫,	১৮ মাঘ	বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কার্য বিবরণ	রাজশাহী সম্মিলনে বক্তৃতা
১৩১৬,	চৈত্র	সাহিত্য	রমেশভবন
১৩১৭,	বৈশাখ	প্রবাসী	লোকশিক্ষা
১৩১৭,	আশ্বিন	মানসী	যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী
১৩১৮,	মাঘ	বঙ্গদর্শন	অভিনন্দন

১৩১৯, চৈত্র — মানসী — চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনে নিবেদন

১৩২১, বৈশাখ —মানসী ও সাহিত্য—সভাপতির অভিভাষণ দান

১৩২২, ১৩ শ্রাবণ — মর্ম্মবাণী — বাঙ্গলায় কর্তৃক

মানসী — স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী

১৩২৩, বৈশাখ — ভারতী — অম্লমধুর

১৩৩৪, বৈশাখ-আশ্বিন
অগ্রহায়ণ-চৈত্র
১৩৩৫, বৈশাখ-আষাঢ়
} মানসী ও মর্ম্মবাণী— বেদকথা